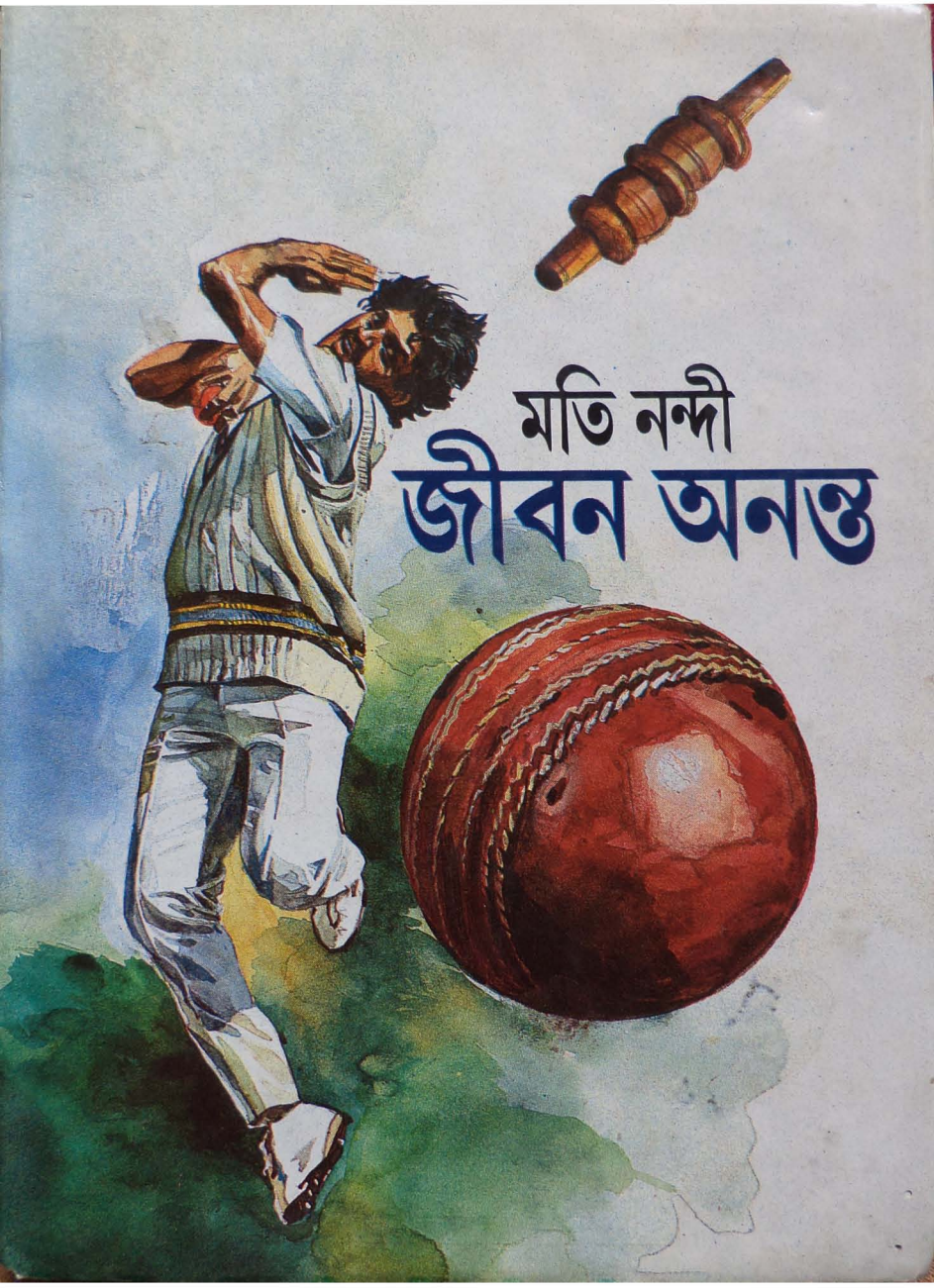

মতি নন্দী

জীবন অনন্ত

জীবন অনন্ত ■ মতি নন্দী

মাঝেমধ্যেই খেলা নিয়ে লেখেন, কিন্তু কখনই খেলা-খেলা লেখা লেখেন না মতি নন্দী। খেলার মাঠ তাই তাঁর গল্প-উপন্যাসে আক্ষরিক অর্থে হয়ে থাকে না নির্দিষ্ট সীমানা-ঘেরা এক চৌহদ্দি। তাঁর সম্পন্ন, সংবেদনশীল কলমে বৃহত্তর জগতেরই এক প্রতীক খেলার জগৎ, বিশেষ জীবনের ধারা যেখানে মিশে যায় অনন্ত জীবনের স্রোতে।

এই মহাজীবন-স্রোতেরই এক আবর্তময় কাহিনী 'জীবন অনন্ত'। আপাতভাবে মনে হতে পারে, অসামান্য এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রের নামেই এই নামকরণ। কিন্তু সানন্দ বিস্ময়ের কথা এই যে, অন্যতর ও মহত্তর এক ব্যঞ্জনাও যে সার্থকরূপে সঞ্চারিত এই নামে, শেষাবধি তা অগোচর থাকে না। অন্য অনেক লেখায় যেমন, এখানেও তেমনই, মতি নন্দীর অভিপ্রায়, মানুষের তথা মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগমনের,লক্ষ্য-অর্জনের দুর্মর সংকল্পের দুর্লভ ছবিটিকে ফুটিয়ে তোলা। কিন্তু করুণরঙীন যে-কাহিনীটি হাসিকান্নার হিরাপান্না দিয়ে এইসূত্রে গেঁথেছেন মতি নন্দী, তার তুলনা বস্তুতই বিরল।

ISBN 81-7066-167-6

জীবন অনন্ত

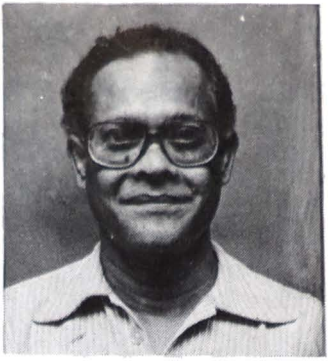

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই খেলা আর
মাঠের সঙ্গে যে-অন্তরঙ্গতা এবং উত্তর
কলকাতার পুরনো পাড়ায় বংশানুক্রমে
প্রায় একশো বছরের বসবাসের ফলে
পরিবেশের সঙ্গে যে-ঘনিষ্ঠতা,
এ-দুইয়েরই জীবন্ত উজ্জ্বল ছাপ মতি
নন্দীর সাহিত্য-রচনায়।
জীবিকাসূত্রেও খেলার জগতের সঙ্গে
যোগাযোগ অব্যাহত। আনন্দবাজার
পত্রিকার ক্রীড়া-বিভাগের সম্পাদক।
সাহিত্যে প্রবেশের সঙ্গে-সঙ্গে সাড়া।
সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্মৃতিতে আয়োজিত
উপন্যাস-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার
পান।
প্রথম গল্প—সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায়,
১৯৫৭ সালে। পুজো সংখ্যায় প্রথম
গল্প 'পরিচয়' পত্রিকায়, ১৯৫৮-য়।
গল্প-উপন্যাস ছাড়াও ক্রিকেটের
নিয়মকানুন ও রেকর্ডস নিয়ে বই
লিখেছেন।
বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে রচনা।
আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন। চলচ্চিত্রে
রূপায়িত হয়েছে কাহিনী।

প্রচ্ছদ : অনুপ রায়

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০০৪

© মতি নন্দী

ISBN 81-7066-167-6

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে মুদ্রিত।

৫০.০০

জীবন অনন্ত

মতি নন্দী

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
কলকাতা ৯

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
প্রিয়বরেষু

জীবন অনন্ত

"কাল খবরের কাগজে কী হেডিং হবে বলতে পারিস ?"

"পারি।"

"কী হবে ?"

"শেষ বলে বান্ধব সমিতির নাটকীয় জয়।"

"বাজে হেডিং।"

"তা হলে, সি এ বি নকআউটের রুদ্ধশ্বাস সমাপ্তি।"

"আরও বাজে।"

"তা হলে..."

জীবন খোলা বুটজোড়া পাশে সরিয়ে রেখে পা দুটো টানটান করে ছড়িয়ে অনন্তর মুখের দিকে তাকাল। ঘামে-ভেজা জামাটা খোলার জন্য অনন্ত মাথা হেলিয়ে টেনে বার করতে কুঁজো হয়েছে, সেই অবস্থাতেই বলল, "আজকাল সাহিত্য করে খেলার হেডিং হয়।" তারপর হাত থেকে জামা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, "জীবনের ছক্কায় বান্ধবের জীবন লাভ, কিংবা জীবনের হাতে অগ্রগামীর জীবনান্ত।"

"এর থেকে বাজে আর কিছু হতে পারে না।" জীবন জোড়া-পা সামনের খালি চেয়ারে তুলে দিল। "এরকম নাম বাচ্চাদের অ্যাডভেঞ্চার গল্পের হয়।"

"চানটা করে আসি তারপর হেডিং বলব।" অনন্ত কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে প্যান্ট খুলতে লাগল।

"আরে দাঁড়া, দাঁড়া, আমি আগে। যা গরম পড়েছে। মে মাসের দুপুরে ক্রিকেট খেলা ? অন্তু প্লিজ, আমি চান করে এলে তুই যাস।"

জীবন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছ' ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, আটষট্টি কিলোগ্রাম ওজনের দেহটা যেন ছাড়া পাওয়া স্প্রিংয়ের মতো টান হয়ে

উঠল। স্নানের ঘরের দিকে সে পা বাড়াবার আগেই অনন্ত ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ভিতর থেকে চেঁচিয়ে বলল, "হেডিং কী হবে জানিস ? জীবন রঞ্জি দলে আসার দাবি রাখল।"

"সিজন শেষ হয়ে গেল আর এখন দাবি রাখা !"

"সামনের সিজনে এই পারফরম্যান্স কাউন্ট করবে বেঙ্গল টিম সিলেকশনের সময়।" ভিতরে শাওয়ার থেকে জল পড়ার শব্দ ছাপিয়ে অনন্তর গলা ড্রেসিংরুমে পৌঁছল।

জীবনের মুখে হালকা হাসি আর বেদনা একই সঙ্গে ভেসে উঠল। বারো বছর বয়স থেকে টেস্ট ম্যাচ খেলার স্বপ্ন সে দেখছে। গত বছর আটটা আর এ-বছর এগারোটা সেঞ্চুরি করেছে স্থানীয় ক্রিকেট-ম্যাচে। কিন্তু এখনও সে বাংলার হয়ে প্রথম শ্রেণীর একটা ম্যাচও খেলার সুযোগ পায়নি। জাতীয় নির্বাচকরা তার খেলা না দেখলে তাঁদের বিবেচনায় সে আসবে কী করে ?

খেলা শেষ হতেই সি এ বি-র ক্লাব হাউসে বান্ধব সমিতির ড্রেসিংরুমে প্রায় একঘণ্টা ধরে তুমুল উচ্ছ্বাস চলেছিল। এখন নির্জন। একে একে সবাই বান্ধব সমিতির তাঁবুতে চলে গেছে। আনন্দ করার জন্য যা কিছু —ভূরিভোজ, পটকা ফাটানো, মালা পরানো, উপহারের প্রতিশ্রুতি, পতাকা তোলা—এখন ক্লাবেই হবে।

ঘরে এখন ক্লাবের মালি মোহন। খেলার সরঞ্জামগুলো গুছিয়ে লম্বা ব্যাগে ভরায় ব্যস্ত। কয়েকদিন পরই তাদের পি· সেন ট্রফির খেলা। খেলার ব্যক্তিগত জিনিসপত্রগুলো কেউ আর আজ বাড়ি নিয়ে যাবে না। জীবন জানলায় এসে দাঁড়িয়ে আকাশে তাকিয়েই ভ্রূ কোঁচকাল।

"মোহনদা, আকাশের অবস্থা দেখেছ ?"

"কালবোশেখি আসছে।"

পশ্চিমে গঙ্গার ওপারে কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে। চিলের মতো তিন-চারটে পাখি শাঁ-শাঁ করে নীচের দিকে নেমে আসছে। বাতাস থমথমে। মেঘ যেন পুবের দিকেই এগিয়ে আসছে। গত তিন-চার দিন গুমোট ভ্যাপসা ছিল। কলকাতার মানুষ বারবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করেছে। ট্রামে, বাসে, ট্রেনে সুযোগ পেলেই প্রতি বছর সকলে

তাই বলেছে, এরকম গরম আর কখনও পড়েনি। অবশেষে বৃষ্টির কালো ঝাণ্ডা উঠেছে আকাশে। কালবোশেখির কুচকাওয়াজ এগিয়ে আসছে। জীবন ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে প্রেসিডেন্টস এনক্লোজারে এসে দাঁড়ানোমাত্র ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রথম ঝলকটা মুখে লাগল।

"আহ্হ।" আপনা থেকেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল স্বস্তির শব্দ। আজ শেষ বলে ছয় মেরে সে এক উইকেটে তার ক্লাব বান্ধব সমিতিকে জিতিয়ে দেবার সময় ঠিক এইরকমই একটা আওয়াজ তার মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়েছিল। সেটা ছিল প্রচণ্ড টেনশন থেকে মুক্তি পাওয়ার স্বস্তি। তার আগের ওভারেই সে সেঞ্চুরিটা পূর্ণ করেছিল।

আজ গরম কত ডিগ্রি হবে মনে হয়? জীবন চোখ বন্ধ করে মুখটা ঠাণ্ডা বাতাসের স্রোতে রেখে আন্দাজ করার চেষ্টা করল। কাল ছিল উনচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাবা বলেছিলেন, 'এভাবে খেলার কোনও মানে হয় না। কেউই তার সেরা জিনিস বার করে আনতে পারবে না এ অসহনীয় অবস্থায়। তা ছাড়া শরীরেরও ক্ষতি করবে। রঞ্জি ট্রফির নকআউট পর্যায়ের আগে এইসব খেলা হলে তবু তার মূল্য থাকে, এইসব খেলায় কেউ ভাল পারফরম্যান্স দেখিয়ে টিমে আসতে পারে। কিন্তু বাংলা তো কোয়ার্টার ফাইনালেই আউট হয়ে গেছে, তা হলে এখন এই ঝাঁ-ঝাঁ গরমে টুর্নামেন্ট খেলে লাভ কী? তবু রক্ষে জে· সি· মুখার্জি ট্রফিতে সেমিফাইনালে হেরে বেঁচে গেছিস, ফাইনালটা খেলতে হবে না।' জীবন তখন মৃদুস্বরে বাবাকে বলে, 'সেমি-ফাইনালে অগ্রগামীর কাছেই সাত উইকেটে হারের বদলাটা নেওয়া দরকার। আমাকে যে রান-আউটটা দেয়, সেটা যে...' সে থেমে গেছল। থেমে যাওয়ার কারণ, অম্বুর একটা কথা মনে পড়ায়। রান-আউট হয়ে ফিরে গিয়েই ব্যাটটা ছুঁড়ে ফেলে সে চেঁচিয়ে উঠেছিল, "জোচ্চুরি, জোচ্চুরি, ক্রিজের ছ' ইঞ্চি ভেতরে ব্যাট ফেলার তিন-চার সেকেণ্ড পর বলটা উইকেটে লাগল।" তখন অম্বু দুটো হাত তার দু' কাঁধে রেখে বলেছিল, 'আউট হয়ে কখনও অভিযোগ করিসনি। মাথার উপর ঈশ্বর আছেন। আম্পায়ার ভুল করতেই পারেন। তিনি তো মানুষ। উপরের ওই লোকটা মানুষের ভুল শুধরে দেন। ক'দিন পরে এদের সঙ্গেই তো নকআউট ফাইনাল। উনি যদি তোর দুঃখের কারণটা বুঝে থাকেন তা

হলে তোকে দেখবেন। কিন্তু কখনও আর কমপ্লেন করিসনি। তা হলে টেস্ট খেলার মতো লেভেলে যেতে পারবি না।'

জীবন এখন ক্লাব হাউস থেকে মাঠ আর বিশাল স্ট্যান্ডের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে হাসল। উপরের ওই লোকটাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে আকাশের দিকে মুখ তুলল। ঘন মেঘ দ্রুত ধেয়ে আসছে, চারদিকে অন্ধকারের ছায়া ঘিরে ধরছে। গাছের মাথা পাগলের মতো দুলছে। পাখিরা ডানা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে। জীবনের বুকটা কেঁপে উঠল অজানা ভয়ে। ঈশ্বর কি এভাবেই দেখা দেন ? বুকের কাছে দু' হাত জড়ো করে নমস্কারের ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে রইল।

"কী রে, কতবার ডাকলুম··· ম্যাচ জিতিয়েছিস বলে কি প্রশংসা ছাড়া আর কিছু কানে ঢোকাবি না ? এতক্ষণ ধরে তো পিঠ-চাপড়ানি খেলি, যা, এবার পিঠটা ঠাণ্ডা করে আয়।"

"আচ্ছা, অন্তু, তুই ঈশ্বর-বিশ্বাসী না ?"

"বাবা বলতেন, কোথাও একটা বিশ্বাস রাখবে। সেটা নোঙরের মতো কাজ করবে, তোমাকে ভেসে যেতে দেবে না। বিশ্বাসটা ঈশ্বরে রাখতে পারো, জন্মভূমিতে রাখতে পারো, দেশের মানুষের উপর রাখতে পারো, বন্ধুত্বের উপরও রাখতে পার।"

"তুই কোনটাতে রাখিস ?"

"সব ক'টাতেই।"

শব্দ করে বৃষ্টির বড়-বড় ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। এলোমেলো হাওয়ার ঝাপটায় জলকণা এসে লাগছে ওদের অনাবৃত দেহে। জীবন জ্বলজ্বলে চোখে দু' হাত বাড়িয়ে হঠাৎ "ইয়াহুউউ" বলে চিৎকার করে উঠে ছুটল সিঁড়ির দিকে। লোহার দরজাটা দড়াম করে খুলে দোতলা থেকে মাঠে নামার সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে ছুটতে-ছুটতে মাঠের ঘাসের উপর গিয়ে দাঁড়াল। তারপর মুখ তুলে অনন্তর দিকে তাকিয়ে সে দু'হাত মাথার উপর তুলল।

"অন্তু, আমি টেস্ট খেলব," চিৎকার করে জীবন আবার বলল, "শুনতে পাচ্ছিস অন্তু, আমি টেস্ট খেলব। ঈশ্বর খবর পাঠিয়েছেন, আমি টেস্ট

খেলব।"

অঝোর বৃষ্টির শব্দ ছাড়া অনন্ত শুনতে পাচ্ছে না আর কিছু। উদ্বিগ্নস্বরে সে চেঁচিয়ে বলল, "ভিজিস না। নিউমোনিয়া হবে।"

ফাঁকা ইডেন মাঠে ঝাপসা দেখাচ্ছে জীবনকে। সে মাঠে গড়াগড়ি দিচ্ছে পুলকে, আনন্দে।

"জীবনের হল কী! পাগল-টাগল হয়ে যাবে নাকি?"

মোহন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

অনন্ত মাথা নেড়ে বলল, "দেখো মোহনদা, জীবন একদিন টেস্ট খেলবেই।"

"আর তুমি?"

হেসে মাথা নাড়ল অনন্ত এমন, ভাবে যার অর্থ বোঝা শক্ত।

"জীবনের স্কুটারটা নীচে রয়েছে। এতক্ষণে ভিজে সেটার যে কী অবস্থা হল কে জানে। আমি নীচে যাচ্ছি, ওটাকে সরিয়ে কোথাও ঢাকা জায়গায় রাখতে হবে।"

একতলায় যাবার জন্য সিঁড়ির দিকে এগিয়েও অনন্ত একবার ঘুরে তাকাল। ঝাপসা বৃষ্টির মধ্যে দেখতে পেল পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির, অর্থাৎ তার থেকে ঠিক এক ফুট খাটো মাথার জীবন চিত হয়ে আকাশের দিকে মুখ করে দু' হাত ছড়িয়ে শুয়ে। নিথর একটা মৃতদেহের মতো। তার বুকের মধ্যে পলকের জন্য ধক করে উঠল।

আধঘণ্টা পর বৃষ্টি থামতে বান্ধব সমিতির তাঁবুর দিকে ওরা রওনা হল। বৃষ্টিতে ভিজলেও স্কুটারের এঞ্জিন গোলমাল করেনি। সি এ বি ক্লাব হাউস থেকে তাঁবু তিন মিনিটের পথ। জীবন আকাশবাণীর সামনের গোলাকার ভূখণ্ডটি খুব জোরের উপর কাত হয়ে ঘুরল। পিছনে বসা অনন্ত তার কাঁধটা খামচে ধরে বলল, "অত স্পিডের ওপর টার্ন করাসনি, বৃষ্টিতে রাস্তা পেছল হয়ে আছে।"

জীবন জবাব দিল না, স্পিডও কমল না। অনন্ত আর কিছু বলল না। জীবন এভাবেই চলে সর্ব ব্যাপারেই। সেটা ওর ব্যাটিংয়ের মধ্যেও ফুটে ওঠে। ঝুঁকি নিয়ে অদ্ভুত সব শট নেয় যা বিশুদ্ধবাদীদের ভ্রূ তুলে দেয়। তারা হতাশায় মাথা নাড়ে আর বলে, "এভাবে খেললে বেশিদূর এগোতে

পারবে না, টেস্ট লেভেলে যেতে পারবে না।" অথচ জীবন ঝুড়ি-ঝুড়ি রান পায়, সেঞ্চুরি পায়!

অনন্তও একবার বলেছিল, "শুনছিস তো তোর সম্পর্কে কী বলা হচ্ছে? তোর বিগম্যাচ টেম্পারামেন্ট নেই।" জীবন অবাক হবার ভান করে বলেছিল, "বিগ ম্যাচটা খেললাম কোথায় যে আমার টেম্পারামেন্ট মাপা হয়ে গেল! ব্যাটসম্যানের কাজটা কি মাঠে নেমে টেম্পারামেন্ট দেখানো না রান তোলার কাজ করা? ব্যাটিংটাকে আমি সহজ-সরলভাবে বুঝি মারার বল পেলেই মারো। যেটা মারতে পারবে না সেটা ছেড়ে দাও বা আটকাও। টেম্পারামেন্টওয়ালারা এই শেষের কাজ দুটোয় খুব ভাল, প্রথমটায় কুঁকড়ে থাকে। ফলে জেতার ম্যাচ হারি।"

"আর হারার ম্যাচ বাঁচায়।"

"আমি হারার বা ড্র করার চিন্তা নিয়ে খেলার মাঠে আসি না।"

আজ জীবনই ম্যাচটা জিতিয়েছে। সাতষট্টি বলে সেঞ্চুরিই শুধু নয়, সমিতির ইনিংস একসময় সাত উইকেটে ছিল একান্ন। সেখান থেকে একশো বাহাত্তরে টেনে নিয়ে গেছে জীবন।

তাঁবুতে তখন হই-হুল্লোড় ঝিমিয়ে এসেছে। ওদের দুজনকে দেখে আবার সেটা জেগে উঠল। অনন্ত একত্রিশ রানে একটি উইকেট পেয়েছে, একটি রান আউট হয়েছে মিড উইকেট থেকে তার ছোঁড়া বলে। তার পিঠে একটা-দুটো আলতো চাপড় ছাড়া আর কিছুই জুটল না। সেজন্য অনন্ত কিছু মনে করল না। আজ সবাইকে ছাপিয়ে একজনই নায়ক। ক্রিকেট সেক্রেটারি বাদল দে তার দামি ঘড়িটা হাত থেকে খুলে জীবনের ডান হাতে পরিয়ে দিল।

"এ কী এ কী, আ রে বাদলদা, আমার যে হাতে ঘড়ি রয়েছে। আর একটা দিয়ে কী করব?"

"দু'হাতে দুটো পরবি। পাকিস্তানে গাওস্কর একটা টেস্টে দুটো সেঞ্চুরি করায় ম্যানেজার গায়কোয়াড তাঁর ঘড়িটা উপহার দিয়েছিলন। আমিও তোকে দিলুম।"

উজ্জ্বল মুখে বাদল দে থুতনি তুলে চারপাশে তাকাল। এই বারই প্রথম ক্রিকেট সেক্রেটারি হয়ে একটা ট্রফি জেতা মানে সে লাকি সেক্রেটারি।

সবার চোখ তাকে বাহবা দিচ্ছে। একজন বলেই ফেলল, "ইনসেনটিভ না দিলে ছেলেরা খেলবে কেন ? নেক্সট রয়েছে পি সেন ট্রফির খেলা। যার পারফরম্যান্সে ট্রফি জিতব তাকে আমি একটা সোনার আংটি দোব।"

প্রশংসার মৃদুগুঞ্জন উঠল।

জীবন তার দুটো হাত তুলল। দু'হাতেই ঘড়ি।"কী মুশকিলে পড়লাম। কোন্ হাতেরটায় সময় দেখব গায়কোয়াড়দা ?

অনন্ত চাপা গলায় বলল, "গাওস্করকে জিজ্ঞেস করে নিস।"

"তার সঙ্গে আমার দেখা হবার কোনও আশাই নেই। যখন আমি বেঙ্গল টিমে চান্স পাব, ততদিনে গাওস্কর ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট থেকে রিটায়ার করে যাবে।"

"কে বলল বেঙ্গল টিমে ঢুকতে তোর দেরি হবে ? সামনের সিজনেই আসছিস, লিখে রাখ। দু' সিজনে উনিশটা সেঞ্চুরি, এখন কার আছে ?" বাদল দে হঠাৎ চিৎকার করে তাঁবুটাকে নীরব করে দিল। অনন্ত একটা সফট ড্রিঙ্কসের বোতল নিয়ে চুপিচুপি তাঁবুর বাইরের চাতালে এসে দাঁড়াল।

ঘন মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। স্যাঁতসেঁতে ভাব রয়েছে বাতাসে। সন্ধ্যা এরই মধ্যে কোন এক ফাঁকে নেমে আসবে। বৃষ্টির জলে ধুলো ধুয়ে গিয়ে গাছের পাতা সবুজে গাঢ় হয়ে উঠেছে। দূরে রাস্তায় অল্পস্বল্প জল জমে। মা এতক্ষণে কলেজ থেকে বাড়ি পৌঁছে গেছে। সকালে বেরোবার সময় অনন্ত যখন প্রণাম করে, মা বাধা দিয়ে বলেছিলেন, "আগে ওনাকে কর।" বসার আর খাবারের জন্য ছোট দালানটার দেওয়ালে বাবার রঙিন ছবি। বেলফুলের বাসী একটা মালা তাতে ঝুলছে। চারদিন আগে বাবার তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী ছিল।

ছবিতে কপাল ঠেকিয়ে অনন্ত যা বলেছিল, সেটাই এমন তার মনে পড়ছে। "আমি তোমার সব কথা মনে রেখেছি বাবা। আমি পরিশ্রম করব, অপেক্ষা করব।" তারপর মুখ ফিরিয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে সে দ্যাখে, বাবার ছবির দিকে মা নির্নিমেষে তাকিয়ে, একটা সুন্দর হাসি চোখ দুটি থেকে ঝরে পড়ছে। সে মাকে প্রণাম করল।

"অন্তু, খেলায় হারজিত আছে। যাই হোক না কেন, তোর বাবা যা

বলতেন সেটাই বলব, চেষ্টা করবি, হাল ছাড়বি না।"

অনন্ত আজ হাল ছাড়েনি। শুধু চেষ্টা নয় কিছুটা ভাগ্যও দরকার হয়। তার বলে দুটো কাচ পড়েছে, সাত-আটবার ব্যাটসম্যানরা হেরে গেছে, তার পেসের কাছে কিন্তু স্টাম্পে বল লাগেনি। এজন্য সে নিজের উপরই রেগে উঠেছিল। প্রত্যেক ফাস্ট বোলারের মতো তারও ইচ্ছে করে স্টাম্প উড়ে যাওয়া দেখতে। কেন সে স্ট্যাম্পে বল লাগাতে পারছে না ? তখন বাবার গলার স্বর যেন সে শুনতে পেয়েছিল, "অন্তু তুমি পরিশ্রম করোনি। ফাস্ট বোলার হতে হলে অসম্ভব খাটতে হয়। লেংথ, আর ডিরেকশন নিয়ে কাজে অবহেলা করে তুমি শুধু পেসের উপরই জোর দিচ্ছ। ভুল করছ।"

হঠাৎ পিঠে একটা থাপ্পড় পড়ায় অনন্ত চমকে উঠল।

"একদৃষ্টে আকাশে তাকিয়ে কী করছিস, ধ্যান ?"

জীবন উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হয়ে রয়েছে। তার হাতে সন্দেশের বাক্স। এগিয়ে ধরল। অনন্ত একটা তুলে নিল।

"বাদলদাকে সবাই ধরেছে পার্ক স্ট্রিটে ডিনার খাওয়াতে হবে। যাবি ?"

"হোটেল-রেস্টুরেন্টে খেতে আমার ভাল লাগে না।"

"আমারও। কাঁটা-চামচ-ফামচ দিয়ে খাওয়া, মনে হয় যেন পেট ভরল না। বাবাকে সকালে মানিকতলা বাজার থেকে একটা কেজি দেড়েকের ইলিশ নিয়ে বাড়িতে ঢুকতে দেখেছি, চল্ আমাদের বাড়ি।"

"এখন বোশেখ মাসে ইলিশ।"

"বাংলাদেশী, দুর্দান্ত টেস্ট।"

ইলিশের নামে অনন্তর জিভ আনচান করে উঠল। সে গলা নামিয়ে বলল, "স্কুটারটা বার করে স্টার্ট দে, রেস্টুরেন্টে খেতে না গিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছি দেখলে আটকে দেবে। চটপট কেটে পড়তে হবে।"

দু'জনে কেটেই পড়ল।

•

জীবনরা অবস্থাপন্ন। বাবার ইলেকট্রনিক্সের যন্ত্রাংশ তৈরির ব্যবসা। একবছর আগে কাঁকুড়গাছির নতুন বাড়িতে ওরা উঠে এসেছে। বাবা, মা আর দুটি ছেলে নিয়ে এই পরিবারটির সবাই তাদের উচ্চতার মতোই ছোট। পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির উপর কেউ নেই। অনন্ত প্রথম দিনে নিজেকে

নিয়ে অস্বস্তি বোধ করেছিল। জীবনের বাবা দেবেনবাবু আমুদে প্রকৃতির মানুষ। অনন্তর মনের অবস্থাটা বুঝে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "এ যে দেখছি গালিভার! লিলিপুটদের বাড়িতে এসে মুশকিলে পড়ে গেলে তো? ঠিক আছে, তোমার বসার জন্য একটা নিচু টুল কিনে রাখব আর আমাদের জন্য রণ-পা।" অনন্তর ভাল লেগে গেছল সবাইকেই। তারপর বহুবারই সে এসেছে গত দেড় বছরে। পিতৃহীন বলে অনন্তকে ওঁরা আলাদা স্নেহ যত্ন করেন, নিজেদের ছেলের মতো।

স্কুটারে আসার সময় অনন্ত বলল, "তুই যখন 'ইয়াহু' বলে চিৎকার করে বৃষ্টিতে ভেজার জন্য ইডেনে নেমে গেলি তখন হঠাৎই প্রথম দিনের কথাটা মনে পড়ে গেছল, এ যে দেখছি গালিভার!"

জীবন মুখ ঘুরিয়ে বলল, "কেন মনে পড়ল?"

"সুইফট তাঁর গালিভারস ট্র্যাভেলসে একটা কাল্পনিক জাতির নাম দিয়েছেন ইয়াহু।" অনন্ত ঝুঁকে জীবনের কানের কাছে মুখ রেখে বলল।

"তুই খুব বই পড়িস?"

"মাঝে-মাঝে পড়ি।"

"আমার পড়তে ভাল লাগে না।" বলেই গিয়ার বদলে জীবন স্কুটারের গতি বাড়াল।

"তুই স্পিড খুব ভালবাসিস।" অনন্ত বলল।

জীবন মাথাটা দোলাল শুধু।

"আজ স্পিড তুলিস না। বৃষ্টিতে রাস্তাটা ভাল নয়, বড্ড গর্ত রয়েছে।"

"আমার মুখস্ত। কোথায় কোথায় গর্ত আর ঢিপি আমার জানা আছে।"

বাড়িতে জীবনের ঘরটি দোতলায় পুব-উত্তর কোণে। ঘরের একটা দেওয়াল শুধু ক্রিকেটারদের রঙিন ব্রো-আপ ছবিতে ঢাকা। মাথায় খাটো ব্যাটসম্যানদের, যেমন ব্রাডম্যান, গাওস্কর, উইকস, বিশ্বনাথ, কালীচরণ প্রভৃতির ছবিই চোখে পড়বে সবার আগে। আগোছালো ঘর। অনন্ত বহুবার থেকে গেছে রাত্রে।

আজও তাকে থেকে যেতে বলেছিল জীবন। অনন্ত রাজি হয়নি। শুধুই ছ'টা ইলিশভাজা আর তেল দিয়ে ভাত মেখে সে খেয়েছে। দু'বার

সাবান দিয়ে হাত ধুয়েও ইলিশের গন্ধ হাত থেকে যায়নি। ডান হাতের তালুটা শুঁকতে-শুঁকতে অনন্ত বলল, "আজ যা আনফিট হয়ে গেলাম কাকিমা, এখন পুরো এক হপ্তা লাগবে শরীর ঠিক করতে। সামনেই আর একটা টুর্নামেন্ট রয়েছে।"

"এই ক'টা ভাত খেয়েই শরীর বসে যায় যদি তা হলে বাপু খেলাধুলো করার দরকার নেই। তোমাদের যত রাগ এই ভাতের উপর, খেলেই নাকি আনফিট হয়ে যাবে!"

অনন্ত মিটমিটিয়ে হাসতে থাকল। আগে সে রাতে রুটি খেত, মাস ছয়েক হল দু'বেলাই রুটি খাচ্ছে। কিন্তু কাকিমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিপছিপে লম্বা ছেলেটা, তাঁর ধারণায় দুর্বল আর রুগণ শুধু পেট ভরে ভাত না খাওয়ার জন্যই। তিনি হাতা হাতা ভাত থালায় ঢালবেনই আর অনন্তও দু'হাত মাথায় তুলে, "আনফিট হব, আনফিট হব" বলে করুণস্বরে ডাক ছাড়বে। আজও তাই হল। তবে একটা কথা অনন্ত যোগ করল, "পার্ক স্ট্রিটের রেস্টুরেন্টের থেকে অনেক তৃপ্তি করে খেলাম, তাই না রে?"

বাদলদা'র দেওয়া ঘড়িটা ডান হাতে পরতে-পরতে জীবন বলল, "বাঙালির কাছে মাছ-ভাতের থেকে সেরা খাদ্য পৃথিবীতে আর কিছু আছে নাকি?"

"অনন্ত রাত হয়ে গেছে আজ নাইবা গেলে।" কাকাবাবু টুথপিক দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বললেন।

"মা'কে বলে আসিনি, ভাববেন।"

"এত রাতে বাস পাবে কি?"

"বিধাননগর স্টেশন থেকে ট্রেনে দমদমায় গিয়ে বাকিটা হেঁটে চলে যাব।"

জীবন ঘড়িতে সময় দেখে বলল, "চল, তোকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

গেট থেকে স্কুটার বার করার সময় জীবন বলল, "ফাঁসির খাওয়া খেয়েছি, পেট ব্যথা করছে।"

"তা হলে তুই পেছনে বোস, আমি চালাই।"

জীবন বিনা প্রতিবাদে পিছনে বসল। স্টার্ট দিয়ে ক্লাচ ছাড়তেই ঝাঁকুনি

দিয়ে স্কুটারটা এগোল। অনন্তর হাত কেঁপে টলমল করে উঠল। সে থামিয়ে দিল এঞ্জিন।

"রেগুলার চালানো অভ্যেস নেই।" অপ্রতিভ হয়ে অনন্ত বলল।

"না চালালে অভ্যেস হবে কি করে, চালা এখন। কতবার বললুম একটা কিনে ফেল।"

অনন্ত আবার স্টার্ট দিয়ে সন্তর্পণে ক্লাচ ছাড়ল। মসৃণভাবে স্কুটার যাত্রা শুরু করল।

"মা রাজি নন। টু হুইলারে মা'র ভীষণ ভয়। কলকাতার রাস্তার যা দশা, এসব গাড়ি চালান উচিত নয়।"

"অত ভয় করলে তুই কোনওদিনই ফাস্ট বোলার হতে পারবি না। আমিও কোনও দিন ফাস্ট বোলিং ফেস করতে পারব না।"

অনন্ত জবাব না দিয়ে রাস্তার দিকে চোখ ও মন নিবদ্ধ রাখল। বৃষ্টির জল রাস্তা থেকে এখনোও সরেনি। ফুটপাথ থেকে মাঝ-বরাবর রাস্তা জলে ডুবে। শুধু মাঝখানটায় কালো শিরদাঁড়ার মতো রাস্তার পিঠটুকু জেগে রয়েছে। অনন্ত মন্থর গতিতে মাঝখান দিয়ে স্কুটার নিয়ে চলল। রাস্তার আলোয় তেজ নেই। দোকানপাট বন্ধ, অন্ধকার লাগছে দু'ধারটা। অন্যান্য গাড়ির হেডলাইটের আলোয় মাঝে-মাঝে রাস্তা আলোকিত হচ্ছে। সামনে থেকে আসা গাড়ির আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তখন সে বাঁ ধারে সরিয়ে নেয় স্কুটার। দ্রুত ধাবমান গাড়ি পেছনে এসে হর্ন বাজিয়ে পথ ছাড়তে বলে। অনন্ত তাড়াতাড়ি ফুটপাথের দিকে সরে আসে।

"জোরে চালা, জোরে চালা। পথ ছাড়ছিস কেন?" জীবন একটু অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে। অনন্ত তাই শুনে স্পিড বাড়াল।

জীবনের এই স্কুটারটা নিয়েই সে চালানো শিখেছে। যখনই সে রাতে থেকেছে ভোরবেলা এই অঞ্চলের নির্জন রাস্তাগুলোয় জীবন তাকে স্কুটার চালানোর তালিম দিয়েছে। অজস্র ফ্ল্যাটবাড়ি। পড়তে মজা লাগত। বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র, বিধানচন্দ্র। কলকাতার এই পুব দিকটায়। কো-অপারেটিভ প্রথায় মালিকানা ভিত্তিতে তৈরি আবাসনগুলোর নাম পূর্বাশা, উদিচী, আইডিয়াল, এলিট। নাম থেকেই কিছুটা বোঝা যায় বাসিন্দাদের রুচি আর মানসিকতা। একটা রাস্তার নাম

বিধান শিশু সরণি। হাসি পেয়ে গেছল তার। জীবন বলেছিল, "বোধহয় এখানে শিশুরা বাস করে বলেই এই নাম।" একটা চারতলা আবাসনের নাম স্কাইলাইন দেখে জীবন মন্তব্য করেছিল, "আমার মত হাইট তারই এই নাম তা হলে কুড়ি তলা বাড়ির কী নাম হবে ?" অনন্ত বলেছিল, "হেভেন লাইন"।

পেছন থেকে একটা বিরাট ট্রাক আসছে কান-ফাটানো এয়ার হর্ন বাজিয়ে।

"পথ ছাড়বি না, সরবি না" পিঠের কাছে রাগী গলায় জীবনের নির্দেশ।

"বড় গাড়িকে সবসময় পথ ছেড়ে দেওয়াই নিয়ম।"

"রাখ তোর নিয়ম। আমাদের গাড়িটা কি গাড়ি নয়, ফ্যালনা ?"

ট্রাকটা প্রায় ধাক্কা দেবার মতো দূরত্বে এসে গেছে। জীবনের পিঠের থেকে হাত-তিনেক পেছনে। ড্রাইভারের পাশে খালাসিটা মুখ বার করে চিৎকার করছে।

স্কুটারের দুই আরোহীকে ধুইয়ে দিচ্ছে দুটো হেডলাইটের আলো।

কী একটা গালাগাল দিল খালাসিটা। জীবন চেঁচিয়ে উঠল। "থামা তো, থামা। ব্যাটাকে টেনে নামিয়ে পেটাব। অন্তু থামা।"

"না।"

"বলছি থামা।" গর্জন করে উঠল জীবন।

পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে সে হান্ডেল ধরা অনন্তর ডান হাতটায় টান দিল। টলে উঠল স্কুটারটা। বাঁ দিকে চাকার মুখটা ঘুরে গিয়েই জলে ঢাকা একটা গর্তে পড়ল। তারপরই ডান দিকে ছিটকে স্কুটারটা রাস্তায় কাত হয়ে পড়ল।

ট্রাকটার ব্রেক কষার কর্কশ আর্তনাদ অনন্ত শুনতে পেল। ফুটপাতের দিকে চিত হয়ে সে পড়েছে জলের উপর। একটা পাতা ভরা গাছ, ডালপালার ফাঁক দিয়ে অন্ধকার আকাশ সে দেখতে পাচ্ছে। মাথার মধ্যে শূন্যতা। ট্রাকের শব্দ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অনন্ত ধড়মড় করে উঠে বসল। দূর থেকে একটা মোটর আসছে। তার হেড লাইটের আলোয় সে দেখল রাস্তার মধ্যে ওলটানো আরশোলার মতো স্কুটারটা পড়ে। এঞ্জিন বন্ধ, পেছনের চাকাটা আস্তে আস্তে থেমে

যাচ্ছে আর বাঁ হাতে ভর দিয়ে জীবন রাস্তা থেকে উঠিয়ে নিজেকে বসানোর চেষ্টা করছে। দেহের বাঁ দিকটা জলের মধ্যে ডোবানো।

মোটর গাড়িটা কাছে এসে পড়েছে। হেড লাইটের আলোয় জায়গাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

"জীবন!" আর্ত চিৎকার করে অনন্ত উঠে দাঁড়াল। জীবন মুখটা ঘুরিয়ে উপর দিকে তুলে বলল, "অন্তু তুই বড্ড লম্বা, নিচু হ।"

অনন্ত ঝুঁকে পড়ল।

"আমার আর টেস্ট খেলা হবে না রে।"

জীবন নিজের ডান হাতের দিকে তাকাল। অনন্ত দেখল আঙুলের ডগা থেকে কব্জি পর্যন্ত মাংস, হাড় থেঁতলে চটকে লাল একটা কাগজের মতো আর তার মাঝে ঘড়ির ডায়ালটা বসানো।

"না জীবন, না। তুই টেস্ট খেলবি। আমি তোকে খেলাব।"

অনন্ত কেন যে বুকফাটা চিৎকার করে কথাটা বলল তা সে জানে না।

॥ দুই ॥

এই দুর্ঘটনার তিরিশ মাস পর, পনেরো নভেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকায় স্টাফ রিপোর্টার দিল্লি থেকে লিখলেন এই প্রবন্ধটি :

"না, না, আর কিছু নেব না। আমাকে শুধু একটা লিমকা দিন।' অবাক হয়ে দেখলাম, এই বলে বক্তা কম্পিত হাতে গ্লাস ভর্তি থাম্‌স আপ তুলে নিলেন। নেশার ঘোরে নয়, তখন তিনি হঠাৎ পাওয়া আঘাত, টেনশন, সব মিলিয়ে প্রকৃতিস্থ-অপ্রকৃতিস্থর সীমারেখায়। ভদ্রলোকের নাম এস পাণিগ্রাহী। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।

"অত্যন্ত গম্ভীর, ব্যক্তিত্ববান এই ভদ্রলোককে এমন অসহায় অবস্থায় এভাবে দেখতে হবে কখনও ভাবিনি। বোর্ডসচিব হরিহরণ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। হরিহরণ পেশায় আইনজীবী এবং শোনা যায় দুঁদে আইনজীবী। তাঁরও প্রায় এই হাল। তার আগে মিনিট-পনেরো রীতিমত নাটক হয়ে গেছে দিল্লির তাজ প্যালেস হোটেলে, সাংবাদিক সম্মেলনে।

"ঘটনাটি এইরকম, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পাঁচ টেস্ট-ম্যাচ সিরিজের প্রথম ম্যাচটির প্রথম বল হওয়ার চব্বিশ ঘণ্টা আগে, হঠাৎই বোর্ডের এক সদস্য ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠে এসে নেট প্র্যাকটিস দেখায় ব্যস্ত সাংবাদিকদের

জানালেন, হোটেলের চারশো দুই নম্বর ঘরে একটা প্রেস কনফারেন্স বিকেল তিনটেয় ডাকা হয়েছে। আপনারা অনুগ্রহ করে আসবেন।

"প্রথম টেস্টম্যাচ শুরুর আগে কিছু মামুলি কথাবার্তা হবে ভেবে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক যাননি। এবং যাঁরা যাননি একটা বড় অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন। ঘরে ঢুকে দেখি, মাথা নিচু করে বসে রয়েছেন বোর্ড-প্রেসিডেন্ট ও সচিব। চোখের চাহনিতে বিষাদ ও অবসন্নতা।

"পাণিগ্রাহীই শুরু করলেন, 'আপনাদের একটা খবর দেবার আছে। টেস্ট-ম্যাচের জন্য নির্বাচিত চোদ্দজন ক্রিকেটারকে যে-চুক্তিপত্র আমরা দিয়েছিলাম মাত্র চারজন (অরবিন্দ নবর, চাঁদ গৌড়া, দেশরাজ আনোখা ও মহম্মদ উসমানি) তার সব শর্ত মেনে নিয়েছে। বাকি দশজনও চুক্তিপত্রে সই করেছে, তবে তিনটি ধারা কেটে দিয়ে। এই ধারাগুলি হচ্ছে বোর্ডের বিনা অনুমতিতে পত্র-পত্রিকায় লিখতে না পারা, অন্য কোনও লোগো ব্যবহার করতে না পারা এবং যে-কোনও টুর্নামেন্টে খেলতে না পারা।'

"নামগুলি তিনি একে একে পড়লেন—মধুরকর, পিল্লাই, পুষ্করনা, ভোজানি, কাপুর, ফরজন্দ আহমেদ, গুপ্তা, ধারাদ্ধার, দুয়া এবং অধিনায়ক মকরন্দ ভার্দে। ভেঙে-পড়া গলায় বোর্ড-সচিব যোগ করলেন, 'এরা আমার সঙ্গে বিশ্বসঘাতকতা করল। আজ সকালেও প্রত্যেকে আশ্বাস দিয়ে গেছে সব শর্ত মেনে নিয়ে সই করবে। শেষ মুহূর্তে এভাবে ডোবাবে ভাবিনি।'

"ভেঙে পড়ার কারণ এতক্ষণে বোঝা গেল। কাল অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রথম টেস্ট-ম্যাচ। খেলোয়াড়দের নাম ঘোষিত হয়ে গেছে। চূড়ান্ত এগারোজনকে ম্যাচ শুরুর এক ঘণ্টা আগে বেছে নেওয়া হবে। এখন এই অবস্থা। বোর্ড-প্রেসিডেন্ট সরাসরিই সাংবাদিকদের কাছে জানতে চাইলেন, 'আপনাদের কী মত? বোর্ডের কী করা উচিত?'

"জনৈক সাংবাদিক ততক্ষণে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। উঠে বললেন, 'বাদ দিয়ে দিন। সবক'টাকে বাদ দিন। দেশের মাঠে খেলা, কোথায় ভাল রেজাল্ট করার চেষ্টা করবে তা নয়, কোথা দিয়ে টাকা পেটা যায় তার ধান্দা করছে।' তার বক্তব্য সমর্থন করলেন অন্যরাও। কিন্তু বোর্ডের দুই কর্তার কিন্তু-কিন্তু ভাব গেল না। পাণিগ্রাহী বললেন, 'কড়া ব্যবস্থা নিতে আমরাও চাই। কিন্তু বাদ দিলে প্রতিক্রিয়া কী হবে ভেবে দেখেছেন? গোটা দেশ আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। আর এই মুহূর্তে তা করা সম্ভবও নয়। খুব বাজে রেজাল্ট হবে।'

"বোর্ড-কর্তাদের বোঝানোর বহু চেষ্টা হল, এই ইস্যুতে ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে

সিদ্ধান্ত নিলে দেশবাসীর সায় তাদের পক্ষেই থাকবে। কিন্তু পাণিগ্রাহীরা ঝুঁকি নিতে রাজি নন। তখন উত্তেজনাটা এমনই চরমে পৌঁছে যায় যে, দিল্লির এক প্রবীণ সাংবাদিক বলেই ফেললেন, 'আসলে আপনারা মেরুদণ্ডহীন বলেই ক্রিকেটাররা এতটা বেয়াড়া হবার সাহস পায়।'

"একেবারেই না চটে পাণিগ্রাহী প্রতিশ্রুতি দিলেন, 'এখন আমাদের হার হল ঠিকই, কিন্তু আমার কথা মিলিয়ে নেবেন, এই সিরিজেই ওদের টিট করব।' জানি না কীভাবে তিনি টিট করবেন, কেন না খেলোয়াড়দের কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেই ওই সই না করা দশজনই বিদ্রোহ করবে। গতকাল হোটেলে অধিনায়ক ভার্দের ঘরে বেশ কিছু সিনিয়র ক্রিকেটার মিলে শলা-পরামর্শ করে ঠিক করেছেন, অধিনায়ককে খবরের কাগজে প্রতিদিনের খেলা সম্পর্কে লিখতে দিতেই হবে। বিপক্ষ অধিনায়করা লিখে চাপ সৃষ্টি করতে পারে যদি তা হলে ভারতের অধিনায়কই বা লিখবেন না কেন? জানা গেল এই 'বিদ্রোহীরা' বোর্ডকে চিঠি দিয়ে তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা জানাবেন। চিঠির খসড়া রচনার ভার কাপুর ও মধুরকরকে দেওয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে বোর্ডের সঙ্গে ক্রিকেটারদের প্রচণ্ড এক সংঘর্ষ আসন্ন। দু'পক্ষই শর্তের ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করতে চায়।

"প্রথম টেস্টের ঠিক আগে এমন অবস্থা তৈরি হওয়ায় খেলোয়াড়দের মানসিক ভারসাম্য যে সুস্থির থাকবে না, তা বোধহয় না বললেও চলে। তবে যদি প্রথম টেস্ট-ম্যাচে ভারত-দল জিততে পারে, বা সম্মানজনক ড্র-ও করতে পারে, তা হলে জনমত ক্রিকেটারদের দিকেই যাবে। তখন বোর্ডের পক্ষে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে না। আর যদি হারে, তা হলে ক্রিকেটাররা কোনঠাসা হয়ে পড়বেই। বোর্ড তখন 'টিট' করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিতে মনে হয় দ্বিধা করবে না। কিন্তু কী ব্যবস্থা তাঁরা নেবেন? সারা দলটিকেই সাসপেন্ড করবেন? তা হলে খেলবে কারা? যাই হোক, এর উত্তর কয়েকদিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে।'"

টিভি সেট বন্ধ করে জীবন বাঁ হাতে আজকের খবরের কাগজটা তুলে নিল। প্রবন্ধটি দু'বার পড়া হয়ে গেছে। তবু আবার চোখ বুলিয়ে সেই জায়গাটায় দৃষ্টি রাখল। যেখানে লেখা 'আর যদি হারে, তা হলে ক্রিকেটাররা··· ।"

এবার সে লেখার প্যাডটা তুলে নিল। টিভি-তে টেস্ট-ম্যাচ দেখতে-দেখতে সে স্কোর লিখে রেখেছে। ভার্দে টস জিতে ব্যাট করার

সিদ্ধান্ত নেয়। লাঞ্চের সময় ভারতের সাত উইকেটে ৫৮ রান। লাঞ্চের পর চার ওভারে ইনিংস শেষ ৭৪ রানে। ৫৩ বলে ২৪ রান দিয়ে লটন পাঁচটি, ৬৬ বলে ২০ দিয়ে ব্রাইট তিনটি আর একটি করে উইকেট নিয়েছে অ্যামরোজ ও স্টিল ১৭ ও ১৩ রান দিয়ে। অতিরিক্ত রান হয়েছে ছয়টি। সবচেয়ে বেশি রান করেছে ভোজনি—২০, তারপর ভার্দে—১০ আর নট আউট রয়ে গেছে গুপ্তা ১২ রানে। তিনজনে শূন্য রান—ফরজন্দ, দুয়া আর পিল্লাই। মধুরকর খেলেনি পিঠে ব্যথা হওয়ায়। তার জায়গায় নেওয়া হয় অরবিন্দ নবরকে। আটটি বল খেলে একরান করে সে বোল্ড হয়। কর্নাটকের মহম্মদ উসমানির এটি প্রথম টেস্ট খেলা। ৪২ মিনিটে ২৫ বল খেলে সে পাঁচ রান করেছে।

জীবন পাতা ওলটাল। ভ্রূ কুঁচকে সে স্কোরগুলো দেখতে দেখতে মনে মনে কী যেন হিসাব করল। অস্ট্রেলিয়া বাকি তিন ঘণ্টায় আট উইকেট হারিয়েছে ১১৮ রানে, ৪৪ ওভার খেলে। ভারতও তা হলে পালটা ঘা দিয়েছে! একদিনে আঠারোজন আউট! টিভি কমেন্টেটররা বারবার উইকেটের কথা বলেছে। কেউ বলেছে আন্ডার প্রিপেয়ার্ড, কেউ বলেছে মেঘলা আবহাওয়ায় আর বাতাসে বল লেট সুইং করেছে, সিম করেছে, লাফিয়ে বুকের কাছে উঠেছে। একজন তো বলল, ভারতের ব্যাটসম্যানদের ফাস্ট বল খেলার টেকনিক জানা নেই, সাহসটাও নেই।

কিন্তু সত্যিই হতভম্ব-করা ক্রিকেট আজ খেলা হল। লটন আর ব্রাইটের বল সত্যিকারের ফাস্ট। দুজনেই চল্লিশটার বেশি টেস্ট খেলেছে, দুজনেরই উইকেট সংখ্যা দুশোর কাছাকাছি। তা ছাড়া পৃথিবীর সেরা অলরাউন্ডারদের একজন জন আরউইন, যার প্রায় তিন হাজার রান আর তিনশো আঠাশ উইকেট, এই টেস্টে খেলছে না। তাতেই মনে হচ্ছে ম্যাচটা আড়াই দিনে শেষ হয়ে যাবে! ভারতের মাটিতে টেস্ট-ম্যাচ প্রথম দিনেই আঠারো উইকেট আগে কখনও পড়েছে কি?

স্বীকার করতেই হবে, ভারতের বোলাররাও সমানে টক্কর দিয়েছে। বোলানের মতো ব্যাটসম্যান, টেস্টে যার ছ'হাজার রান, সতেরোটা সেঞ্চুরি, সেও মাত্র নয় রান করল। নট আউট আছে ওপেনার রজার্স ৪৪ রানে আর ব্রাইট ১২ রানে। লটন ১৯ করেছে। তা ছাড়া বাকি সাতজন ডাবল

ফিগারেই পৌঁছতে পারেনি। চমৎকার বল করল কাপুর আর দুয়া। আটটির মধ্যে দুয়া চারটি, কাপুর তিনটি উইকেট পেয়েছে। একটি রান আউট।

জীবন অস্থিরবোধ করতে লাগল। ম্যাচটায় যদি ভারত জেতে ? বলা যায় না, ক্রিকেটে কিছুই বলা যায় না! যদি জিতে যায় তা হলে ক্রিকেট-বোর্ড টিট করার সুযোগ হারাবে। ক্রিকেটারদের নিয়ে দেশ জুড়ে নাচানাচি শুরু হয়ে যাবে। কার ঘাড়ে তখন ক'টা মাথা থাকবে ওদের বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেবার জন্য! বরং ওদের সমর্থন করেই ওইসব সাংবাদিকরা, যারা বলে আপনারা মেরুদণ্ডহীন বলেই ক্রিকেটাররা বেয়াড়া হবার সাহস পায়, তারাই তখন বলবে কাগজে লিখতে দিতে ক্ষতি কি ? খুশিমতো লোগো পরলে ক্রিকেট অশুদ্ধ হয় না। ম্যাচ জেতাটাই তো আসল কথা।

কিন্তু জীবনের কাছে এই ম্যাচটা জেতা আসল কথা নয়। প্রবন্ধটায় পাণিগ্রাহীর একটা কথা তার মাথায় গেঁথে আছে সকাল থেকে। 'আমার কথা মিলিয়ে নেবেন এই সিরিজেই ওদের···।' আর জনৈক সাংবাদিকের প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে বলা কথাটাও, 'বাদ দিয়ে দিন। সবক'টাকে বাদ দিন'। দুটো কথা মিলিয়ে তার মধ্যে যে ঘূর্ণি তৈরি হচ্ছিল, সেই ফেনানো আবেগ নিয়েই সে টিভি-তে দেখল ভারতের ব্যাটিংয়ের চুরমার ধ্বংস, তখন সে মনে-মনে চেয়েছিল, হারুক, ভারত হারুক। এই ক্রিকেটারদের টিট করতে হলে এইরকম। একটা ধাক্কা দরকার। সবক'টাকে বাদ দিক। নতুন টিম হোক। তা হলে···।

কিন্তু সেই 'তা হলে'টা মুছে দিল দুয়া আর কাপুর। ভারত আবার খাড়া হয়ে উঠেছে। সেকেন্ড ইনিংসেও কি এইরকম একটা সমান সমান অবস্থা তৈরি হবে ?

জীবন পায়চারি শুরু করল। বারান্দায় এসে রাস্তার দিকে অন্যমনস্ক হয়ে লোকজন, গাড়ির চলাচল কিছুক্ষণ দেখে আবার ঘরে এল। উইকেট, কোনও সন্দেহ নেই উইকেটের জন্যই আঠারোজন আউট হয়েছে। ভার্দে বা বোলানের মতো টেকনিক্যালি অত বড় ব্যাটসম্যানরাও কীভাবে আউট হল! টিভির রিপ্লেটা জীবনের চোখের সামনে আবার ভেসে উঠল।

উইকেটে বল পড়ে সিম করে ঢুকল, কোমরের কাছে উঠে এল, দু'জনেই ছ'ফুট লম্বা, ব্যাট সরাতে পারল না।

কিন্তু উইকেট কি এই রকমই থাকবে ? এদের চরিত্র বদলায়। এমনকী এবেলা-ওবেলাও বদলে যায়। কাল যদি স্বাভাবিক হয়ে যায় ভারত কি আড়াইশো তুলতে পারবে ? ফোর্থ ইনিংসটা খেলতে হবে অস্ট্রেলিয়াকে। পিচ যদি ডিটোরিয়েট করে ! ধারাদ্ধার আর ফরজন্দের অর্থডক্স লেফট আর্ম স্পিন, পুষ্করনার অফ স্পিন যদি লাইন পেয়ে যায় আর ভালভাবে ঘোরে, তা হলে···।

বাঁ হাতে ফলসটা নিয়ে প্যাডের কাগজে সে কাঁপা কাঁপা লাইনে একটা মুখের স্কেচ করতে লাগল। তা হলে এই টিমই থাকবে। অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে দু-তিনজন ছাড়া কেউই উঁচুদরের স্পিন খেলতে পারে না। জীবন দীর্ঘশ্বাস চাপল। ঘসঘস করে স্কেচটার নীচে লিখল, "কোনও আশা নেই টেস্ট খেলার।"

অক্ষরগুলো ধ্যাবড়া, বাঁকা এবং ছোট-বড়। বাঁ হাত দিয়ে লেখার অনুশীলন রোজই সে করে। ধীরে-ধীরে লিখলে পরিচ্ছন্ন লেখা হয়। দ্রুত লিখতে গেলেই অসমান হয়ে যায়। সেই দুর্ঘটনার পরের দিনই ডান হাতের কবজির চার ইঞ্চি উপর থেকে হাতটি কেটে বাদ দিতে হয়েছে। নকল একটা হাত এখন লাগান। সেটা ঢাকতে সে গায়ের চামড়ার রঙের সুতির গ্লাভস পরে আর ঢিলে লম্বা-হাতা পাঞ্জাবি। ডান হাতে হালকা ছোটখাটো কাজ যেমন বই ধরে পড়া বা পরদা সরানো থেকে চলন্ত মোটর গাড়ির স্টিয়য়ারিং ধরে থাকার মতো কাজও পারে। ঘুড়িও উড়িয়েছে, অসুবিধে হয়নি।

প্যাডটা টেবলের উপর ছুঁড়ে রেখে সে নিজের ঘরে এল। ঘরের দেওয়াল পরিষ্কার, একটা ছবিও নেই। ক্রিকেট খেলার কোনও সরঞ্জামও নেই। একটা হাতকাটা সোয়েটার পরে নিয়ে তার উপর পাঞ্জাবি পরল। গাড়ির চাবি আর টাকার পার্স্ পকেটে রেখে সে একতলায় নেমে এল।

বাবা কাজে বেরিয়েছেন, মা তার বন্ধুর বাড়ি গেছেন, ভাই কোথায় গেছে কে জানে। জীবনকে দেখে বাড়ির কাজের লোক বলল, "বড়দা কি গাড়ি বার করবেন ?"

"হ্যাঁ, গ্যারাজের শাটারটা তুলে দাও।"

এই গাড়ি কেনা নিয়ে আপত্তি ছিল তার মায়ের। স্বাভাবিকই। দু'চাকারই হোক বা চার চাকারই হোক, তিনি ছেলেকে গাড়ি চালাতে দিতে নারাজ কিন্তু বাবা রাজি। স্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন, 'জীবন তো স্বাভাবিকই, ও তো পঙ্গু হয়ে যায়নি। একটা হাতের একটুখানি শুধু নেই, তা ছাড়া সবই তো ঠিকঠাক রয়েছে। তা হলে ওকে অসহায়, অনুপযুক্ত ভাবছ কেন ? তার থেকেও বড় কথা, ও নিজে যাতে নিজের সম্পর্কে এইরকম না ভাবে সেটাই তো আমাদের দেখা দরকার। নিজেকে অক্ষম মনে করলে সে কষ্ট পায়, দুঃখ পায়, জীবনে দাঁড়াতে পারে না। নিজেকে বোঝা মনে করলে তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। তুমি কি তাই চাও ? জীবনকে ভুলে যেতে দাও ওর অঙ্গহানি ঘটেছে। ওকে বুঝতে দাও, আর পাঁচজনের মতোই সে স্বাভাবিক।'

তখন মা বলেন, 'কিন্তু ও যে মারা যেতে পারত। ভগবানের দয়ায় শুধু বেঁচে গেছে।' বাবা হেসে বলেছিলেন, 'আমরা যে-কেউই তো যে-কোনও সময়, যে-কোনও জায়গায় দুর্ঘটনায় মারা যেতে পারি। তাই বলে কি কেউ গাড়ি চালায় না ? জীবন নিশ্চয় ওর অসুবিধেগুলো কাটিয়ে উঠবে।'

পুরনো এই প্রিমিয়ারটা বাবা কিনে দিয়েছিলেন দেড় বছর আগে। সেই থেকে স্বচ্ছন্দে নিখুঁতভাবেই জীবন গাড়ি চালাচ্ছে। আজও সে গাড়ি নিয়ে কাঁকুড়গাছি মোড়ে, রাস্তা জুড়ে দাঁড়ানো মিনিবাসের জন্য তৈরি জ্যামের মধ্য দিয়ে পথ করে এগোল।

পথে শুধু একটা জায়গায়, একটা মোটা গুঁড়িওলা গাছের কাছে সে অ্যাক্সিলেটরের থেকে পায়ের চাপ তুলে গাড়িটাকে মন্থর করল। দাঁতে দাঁত চেপে, চোয়াল শক্ত করে তারপর সে ডান পায়ে অ্যাক্সিলেটর চেপে, মেঝেয় মিশিয়ে দিল। একটা খ্যাপা ষাঁড়ের মতো প্রিমিয়ারটা ছুটল দমদমের দিকে, অনন্তদের বাড়ির উদ্দেশে।

॥ তিন ॥

রেল লাইনের পুবে একটা টানা লম্বা ঝিল। ঝিলের পুব দিকের পাড় ঘেঁষে একতলা বাড়ি। একটা দালানকে ঘিরে তিনটি শোবার ঘর, রান্নাঘর

ও স্নানঘর। দালানের পশ্চিমটা বাইরে খোলা তবে কোলাপসিবল লোহার দরজা আছে। দালানের লাগোয়া বাইরে একটা চাতাল, যার মাথার উপরে ঢালু করে নামানো লাল টালির ছাদ। চাতালটা থেকে দু'ধাপ নেমে সামনের রাস্তা পর্যন্ত তিরিশ ফুট ঘাসের জমি। সেখানে কিছু ফুল গাছ। ঘাসের এই আঙিনাতেই ইজিচেয়ারে স্বামী-স্ত্রী বিকেল-সন্ধ্যায় বসতেন। পশ্চিমে ঝিল তারপর রেললাইন, তারপর অস্তগামী সূর্য। ওরা দেখতেন, মৃদুস্বরে এটা-ওটা নিয়ে কথা বলতেন। একমাত্র ছেলে কাছাকাছি মাঠ থেকে খেলা সেরে ফিরে এসে ওদের কাছে বসত। তিনজনে কিছুক্ষণ গল্প করার পর ছেলেটি হাত-মুখ ধুয়ে, কিছু খেয়ে পড়তে বসত। বাবা-মা দু'জনেই কলেজ শিক্ষক। তাঁরাও তখন অধ্যয়নে বা ছাত্রদের খাতা দেখার কাজ নিয়ে বসতেন। রান্নার ও সংসারের জন্য এক প্রৌঢ়া আছে। ঠিক দশটায় বাড়ির আলোগুলি নিবে যেত, ঠিক ভোর পাঁচটায় দালানের কোলাপসিবল দরজার তালা খুলে ছেলেটি দৌড়তে বেরোত বাবার সঙ্গে।

বাড়িটা একটা ষাট ফুট লম্বা জমিতে। জমির এক ধার ঘেঁষে বাড়ি, অন্য ধারে কুড়ি ফুট চওড়া খালি জমি। সেখানে পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, কাগজিলেবু, পালংশাক, লাউ, কুমড়ো ইত্যাদির কিচেন গার্ডেন। এই তরকারি-বাগানের পরিচর্যাই ছিল স্বামী-স্ত্রীর অবসর বিনোদন।

একদিন ছেলেটি বাবার কাছে পয়সা চাইল রবারের বল কেনার জন্য। সে এবং কয়েকজন মিলে ক্রিকেট খেলবে। বাবা পয়সা দিলেনই শুধু নয়, ওদের খেলা দেখার জন্য বাড়ি ফেরার সময় মাঠের ধারে দাঁড়িয়েও পড়তেন। তিনি স্কুল ও কলেজ টিমে ক্রিকেট এবং ফুটবল খেলেছেন। বাচ্চাদের সেই খেলা দেখতে-দেখতে তাঁর মনে হল, ছেলের মধ্যে খেলোয়াড় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ওর শরীরের পটুত্ব এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছাটা অন্য ছেলেদের থেকে বেশি। তিনি স্থির করলেন ছেলেকে উৎসাহ দেবেন ক্রিকেটার হয়ে ওঠার জন্য।

তিনি প্রথম টেস্ট ম্যাচ দেখতে ইডেন গার্ডেনসে যান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ যখন ভারতে দ্বিতীয়বার সফর করতে আসে। রয় গিলক্রিস্ট এবং ওয়েস হলের ফাস্ট বোলিং তাকে স্তম্ভিত করে। তিনি অদ্ভুত এক সিরসিরানি অনুভব করেছিলেন রোমকূপে, হৃৎস্পন্দনের গতি দ্রুত হয়েছিল বল করার

জন্য বোলারদ্বয়ের ছোটার সময়। বিস্ফারিত চোখে প্রবল গতিতে এক উচ্ছ্বাসের ধেয়ে যাওয়া এবং প্রচণ্ড বিস্ফোরণে শক্তিমত্তার ফেটে পড়া দেখতে-দেখতে তিনি যে শিহরণ অনুভব করেছিলেন, যে মুগ্ধতায় তাঁর দু'চোখ ভরে গেছল তা আর ভুলতে পারেননি। অরুণ সেন স্থির করলেন অনন্তকে ফাস্ট বোলার তৈরি করবেন।

তিনি খেলা শেখার বই কিনে পড়তে শুরু করলেন। ফাস্ট বোলিং সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। বই পড়ে কিছুটা ধারণা হল। তবে একটা জিনিস তিনি বুঝলেন শুধু বই পড়ে নয় আসল শিক্ষাটা হয় প্রত্যক্ষ করে, ভাল বোলারদের বল করা দেখে। শীতকালে রবিবারে ঝুলি কাঁধে তিনি ছেলেকে নিয়ে কলকাতার ময়দানে খেলা দেখাতে আসতেন। ঝুলিতে থাকত খাবার। খেলায় যখন লাঞ্চ হত, ওরাও তখন মাঠের ধারে বসে খেয়ে নিত। খেলা চলার সময় অনন্তকে তিনি বুঝিয়ে দিতেন বোলিংয়ের কলাকৌশল। বাড়ির গায়ে লম্বা সরু জমি, যেখানে তাদের রান্নার বাগান, সেখানে অরুণ সেন ছেলেকে অনুশীলন করাতে লাগলেন পিচ তৈরি করে। বাগান উঠে যাওয়ায় তনিমা সেন আপত্তি করেননি। স্বামী এবং পুত্রের উৎসাহ ও নিষ্ঠাকে তিনি আড়াল থেকে সমর্থন করেছেন। তাঁদের ছিল শান্তির এবং সুখের সংসার।

ছোট একতলা বাড়িটা তার বাসিন্দাদের মতোই সাদাসিধে, বাহুল্যবর্জিত। আকর্ষক কিন্তু দামি আসবাবহীন। অরুণ এবং তনিমা 'স্মল ইজ বিউটিফুল', এই নীতিতে বিশ্বাসী। ওঁরা মনে করেন, জীবনকে নানা ধরনের আরাম ও বিলাসের মধ্যে টেনে নিয়ে গেলে তাঁদের মন ও সময় নানারকম হাবিজাবিতে জড়িয়ে শুধু তাতেই মগ্ন হয়ে যাবে, মুক্ত স্বাধীন অবস্থাটা হারাবে। জীবনকে অনেক তীক্ষ্ণ, চেতনাকে অনেক উজ্জ্বল এবং মনকে কালিমামুক্ত রাখার জন্য ওঁরা প্রয়োজনের বেশি কোনও কিছু দিয়ে নিজেদের ঘেরাও করতে দেননি।

এই ধরনের মানসিকতার জন্যই অরুণ সেন এককথায় বড় প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রায় পনেরো লক্ষ টাকা মূল্যের ভাল অবস্থার রাসায়নিক জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে বলে সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য তাঁকে চাপ দিচ্ছিল তাঁর উপরওয়ালা। যন্ত্রগুলো খারাপ হয়ে গেছে

তাই কম দামে বিক্রি করা এবং যাকে বিক্রি করা হবে তার কাছ থেকে টাকা খাওয়ার এই ষড়যন্ত্রে অরুণ সেন নিজেকে মেলাতে রাজি হননি। তাঁকে তখন প্রলোভন দেখানো হয় আরও বেশি বেতন, আরও বড় ফ্ল্যাট, আরও বড় গাড়ি, সেরা চিকিৎসা, প্রতি বছর পাহাড়ে কি সমুদ্রতীরে সপরিবার ছুটিযাপন সবই কোম্পানির খরচে তিনি পাবেন। এখনও তিরিশ বছর বাকি অবসর নেওয়ায়। তিরিশ বছর ধরে তিনি এইসব ভোগ করতে পারবেন!

সেদিন অফিস থেকে ফিরতে-ফিরতে অন্যান্য দিনের মতই রাত প্রায় ন'টা হয়ে গেছল। অন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনওদিনই তাকে জাগা অবস্থায় পান না। সারাদিনে একবারও ছেলেকে সঙ্গ দিতে, ওর সঙ্গে গল্প করতে, খেলা করতে পারেন না। এই যে সময় দিতে পারছেন না, এর বিনিময়ে তা হলে অন্তুকে তিনি কী দিতে পারেন? কয়েক বান্ডিল টাকা? সন্তানকে দিয়ে যাওয়ার জন্য শুধু এটাই কি পিতার সেরা জিনিস? উত্তরাধিকার হিসাবে তাঁর মনে হয়নি টাকাটাই যথেষ্ট।

অরুণ সেন তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'যদি চাকরি ছাড়ি তা হলে এখনকার স্বাচ্ছন্দ্য, এই ফ্ল্যাট, এই গাড়ি, কিছুই থাকবে না। তোমার কি তাতে অসুবিধা হবে?' তিনি জানতেন তনিমা কী উত্তর দেবেন। তবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন। অনন্তর তখন পাঁচ বছর বয়স। 'অন্তু নোংরা টাকায় মানুষ হোক, নিশ্চয় তা চাই না।' তনিমা এই জবাব দিয়েছিলেন। এর সাতদিন পরই দমদমের এই বাড়িটা কিনে, অরুণ সেন চাকরিতে ইস্তফাপত্রটি লিখে ফেলেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই রসায়নবিদ্যার প্রথম শ্রেণীর এম এসসি। দু'জনেই কলেজে শিক্ষকতার কাজ পেয়ে যান একমাসের মধ্যে।

অনন্তর বয়স যখন এগারো, একদিন সে রাস্তা থেকে একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে পায়। ব্যাগটা সে বাবাকে দেয়। ব্যাগে ছিল একশো তেরো টাকা আর মালিকের নাম ও ঠিকানা।

'এই টাকাটা দিয়ে একটা ব্যাট কেনা যাবে না?'

'অন্য একজনের নাম-ঠিকানা-লেখা ব্যাগের টাকা নেওয়াটা আমাদের

পক্ষে সৎ না অসৎ কাজ হবে বলে মনে করো ?'

'অন্যের ব্যাট নিয়ে খেলতে আমার বিচ্ছিরি লাগে।'

'আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'অসৎ কাজ, এটা তো তুমি জানোই, তা হলে আর— ।'

'কিন্তু তুমি এটা জানো কি না আমি সেটাই জানতে চাই।' তীব্র স্বরটাকে কোমল করে অরুণ সেন তারপর বলেন, 'অন্তু, জীবনটাকে সোজা সরল রাখো। যেমন ঠিক কাজ আছে তেমনিই বেঠিক কাজও আছে আর সোজাভাবে যদি এদের দিকে তাকাও, তা হলে দেখবে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। যখন কোনও কিছুকে বেঠিক বলে জানবে, তখন সেটা করার চেষ্টা করে সময় নষ্ট কোরো না। কারণ সেটা করে তুমি আনন্দ পাবে না।'

'এটা একশো তেরো টাকা না হয়ে যদি এক লক্ষ টাকা হত ?

'সংখ্যাটা বিরাট হলেই ভাল বা মন্দের নীতিটা বদলে যায় না। টাকাটা যদি রাখি, আমি তো জানবই এটা অন্যায় আর নিজেকে তখন আমার খুব খারাপ লাগবে। লাখ টাকা আমার দরকার নেই কিন্তু আমার ভীষণ দরকার নিজেকে ভাল লাগা।' অরুণ সেন ছেলেকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'নিজেকেই যদি তোমার প্রিয় না লাগে তা হলে কাউকে, কোনও জিনিসকেই তোমার আর প্রিয় লাগা সম্ভব নয়।'

দু'দিন পরেই অরুণ সেন দেখলেন বিকেলে অন্তু বাড়ির দেওয়ালকে উইকেট করে একা-একাই বল করে যাচ্ছে মাঠে খেলতে না গিয়ে।

'কী হয়েছে ?'

'ওরা আমায় গাধা বলেছে, আরও অনেক কিছু বলেছে মানিব্যাগটা তোমায় দিয়েছি বলে।'

'সেজন্য ওদের সঙ্গে খেলবে না ?'

'না। তুমিই তো বললে, ঠিক কাজ করলে নিজেকে নিজের ভাল লাগে।'

'তোমার নিজেকে ভাল লাগছে ?'

'হ্যাঁ।' বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে অন্তু বলেছিল, 'কিন্তু কেউ আমাকে পছন্দ করে না।'

'আমি করি। তোমাকে খুব বড় মনে করি। আমার ছেলে বলে সেজন্য গর্বও হচ্ছে।'

মুখের হাসিতে অন্তর মুখ ছলছলিয়ে উঠল। সে শুধু বলল, 'আমি তোমার ছেলে।'

'নিশ্চয়।'

দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে নীরবে বসে রইল। বাবা আর ছেলে, শিক্ষক আর ছাত্র।

অরুণ সেন বাড়ি থেকে কিছু দূরে একটা বড় ক্লাবে অনন্তকে নিয়ে গেলেন। তাঁর এক ছাত্র সেই ক্লাবের খেলোয়াড়। জেলার লিগে খেলে। স্কুলের টিমেও অনন্ত সুযোগ পেয়েছে। ১৫ বছরের কম বয়সী স্কুল ছাত্রদের বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে বাংলা দল গড়ার ট্রায়াল ম্যাচে সে হ্যাটট্রিক করায় দুটি ইংরেজি কাগজে সেটা উল্লিখিত হয়। পড়াশুনোয়ও সে ভাল। কিন্তু খেলা এবং পড়ায় ভাল হওয়ার জন্য, তার উপর বাংলা স্কুল দলে খেলায়, ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক হাজার টাকা স্কলারশিপ পাওয়ায় আর বাঙ্গালোরে একমাসের সর্বভারতীয় ক্যাম্পের জন্য নির্বাচিত হওয়ায় ক্রমশ সে ক্লাসের বন্ধুদের কাছে প্রায় একঘরে হয়ে যেতে লাগল। অরুণ সেন এতে বিস্মিত হননি। কোনও কিছুতে সেরা হওয়া মানেই নিঃসঙ্গ হওয়া। সেরা মানেই হল চরম বা পরম, এর অর্থ নাম্বার ওয়ান। আর সেটা একজনই মাত্র হতে পারে। 'স্কুলে সব ছেলের মধ্যে খেলাধুলোয় সেটা তুমি।' অনন্তর কাঁধ-ধরা মুঠোটা শক্ত করে তিনি বলেছিলেন, 'একা হয়ে যাচ্ছ ? তাই যাও। কিন্তু তুমি মোটেই একা নও। এখন অবশ্য সেরকমই মনে হবে, কিন্তু পৃথিবীতে তোমার মতো আরও অনেক একা মানুষ রয়েছে। কোনও-না-কোনওভাবে, কোনও-না-কোনওদিন, এক নম্বররা পরস্পরকে খুঁজে পেয়ে যাবে।'

অরুণ সেন আরও অনেক কথা তাঁর ছেলেকে বলতে চেয়েছিলেন কিন্তু সব কথা একসঙ্গে বললে এত অল্পবয়সী মন বুঝতে পারবে না ভেবে আর বলেননি। সেই রাতে তিনি একটা নোটবইয়ে লেখা শুরু করেন। প্রথম পাতায় বড়-বড় অক্ষরে লিখলেন, 'অন্তর জন্য বাবার পরামর্শ'। তিনি স্থির

করলেন, অন্তুর জানা দরকার এমন সব কথা যখনই তার মনে উদয় হবে সেগুলো লিখে রাখবেন। যখন বড় হয়ে কথাগুলোর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে তখন নোট বইটা ওকে দেবেন।

তিনি প্রথম দিন লিখেছিলেন :

যতই তোমার বয়স বাড়তে থাকবে ততই তুমি শুনবে, যেসব মহৎ গুণাবলীর দ্বারা আমাদের এই বিরাট প্রাচীন দেশ বিদেশী শাসকের সঙ্গে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে সেইসব গুণাবলীকে লোকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছে। সেগুলি হল : সততা, বিনয়, কঠোর পরিশ্রম, দৃঢ়তা, গুরুজনদের ও নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান, প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস, দেশকে ভালবাসা।

অন্তু, সততা গুণের জন্যই তুমি মানিব্যাগটা আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে। সেজন্য বন্ধুরা তোমায় বোকা গাধা বলেছিল। তারা চেয়েছিল টাকাগুলো খরচ করতে। এটা চুরিরই সমান অপরাধ। পুত্র, নিজের জায়গায় অটল হয়ে দাঁড়াও। নির্বান্ধব হয়ে পড়ার ভয়ে, যেসব শিক্ষা তুমি পেয়েছ, তা যদি কয়েকটা চোরকে বন্ধু হিসেবে পাবার জন্য বিসর্জন দাও তা হলে সেটা খুব ভালদরের লাভ বলা যাবে না।

'অন্তু, টেলিভিশন-সেট এখন তোমার দরকার নেই।' অরুণ সেন বললেন। 'তুমি টিভি সেট চাও, আমিও চাই। কিন্তু আমি তোমাকে শুধু সেইটাই দিতে পারি, যা তোমার সত্যিকারের দরকার—খাদ্য, গৃহ, শিক্ষা, সেইরকম মা আর বাবা যাঁদের সময় এবং যোগ্যতা আছে তোমাকে ভালবাসা দেবার।'

'আমাদের ক্লাসের দু'জনের বাড়িতে ইনস্টলমেন্টে টিভি সেট কিনেছে। ওইভাবে তো আমরাও কিনতে পারি।'

'হয়তো পারি। কিন্তু তার আগে বলো, একজন দোকানি কেন এভাবে কিস্তিতে টাকা নিয়ে একটা জিনিস তোমাকে দিচ্ছে ? তার কারণ, সে ধারে দেওয়ার জন্য সুদও নিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দেখবে আড়াই হাজার টাকার জিনিসের জন্য তুমি তিন হাজার টাকা দিয়েছ। যেহেতু তুমি প্রথমেই একবারে টাকাটা দিতে পারছ না তাই বেশি টাকা দিয়ে জিনিস নিচ্ছ, এর কি কোনও মানে হয় ? অন্তু আমি এখন টিভি সেট কিনতে পারব না, এই নিয়ে তুমি আর কোনও কথা বলবে না।'

সেই রাতে অরুণ সেন লিখলেন :

অন্তু, ভীষণভাবে চাই তোমাকে একটা টিভি সেট কিনে দিতে, কিন্তু তা করতে হলে আমাদের জমানো টাকা থেকে তুলে সেটা কিনতে হবে। অথচ ওই সঞ্চয়টাই আমাদের মনের শান্তি। আমি বা তোমার মা প্রাইভেট কোচিং করি না, করলে আমাদের আয় অনেক বেড়ে যেত। আমাদের চলতে হয় নির্দিষ্ট একটা সামর্থ্যের গণ্ডির মধ্যে। এইজন্যই যাতে আমরা তোমার সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে পারি, আরও বেশি মানসিক স্বাধীনতা আমরা পাই যাতে সততা ও নির্ভীকতার পথে, জীবনের শুভ দিকগুলো খুলে দেবার পথে তোমাকে এগিয়ে দিতে পারি, যাতে তুমি সুখী হতে পারো। তোমার মা আর আমি এইরকমই ভেবেছি আর আমাদের বিশ্বাস সেটা কার্যকরও হচ্ছে। টিভি সেট আমাদের সকলেরই আনন্দের কারণ হবে কিন্তু তার জন্য আমাদের পরিকল্পনাটাও বদলাতে হবে।

কিন্তু জীবনের একটা ধরন আছে। একটা জিনিসের পর আর-একটা। আমাদের সঞ্চয়টা চলে গেলে আমাকে তখন টিউশনির কথা ভাবতে হবে, তখন আমি তোমার সঙ্গে, তোমার মায়ের সঙ্গে আর সন্ধ্যাটা কাটাতে পারব না।

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে মধ্যাঞ্চলের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা হয় কলকাতায়, সি সি অ্যান্ড এফ সি মাঠে। অনন্ত দলের সঙ্গে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের এক হোটেলে ছিল। হোটেলে যাওয়ার আগের দিন রাতে তনিমা ইস্ত্রি করছিলেন অনন্তর প্যান্ট-শার্ট। এক গ্লাস দুধ খাচ্ছিল সে। গ্লাসটা হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গেল। অরুণ সেন বই পড়ছিলেন। মুখ তুলে বললেন, 'নার্ভাস হচ্ছ?'

লজ্জিত অনন্ত প্রতিবাদ করে। তনিমা বলেন, 'নার্ভাস হওয়া তো স্বাভাবিকই। এত বয়স্ক সব ছেলে বয়স ভাঁড়িয়ে শিং ভেঙে বাছুর সেজে খেলছে, তাদের সঙ্গে এইটুকু ছেলে—'

'খেললেই বা! অন্তুকে লড়তে হবে জেতার জন্য, তাই না অন্তু? ক্রিকেটে তো আর হাতাহাতি যুদ্ধ হয় না! স্কিল আর বুদ্ধি থাকলে বয়স্করাও ছোটদের কাছে হার মানে। জেতাটাই মূল ব্যাপার, এর কোনও বিকল্প নেই।'

'বাবা, ভাগ্যেরও তো কিছু সাহায্য চাই।'

'হ্যাঁ তাও দরকার। তবে কী জানো, সবার উপরে থাকাটা যদি অভ্যাস করে ফেলতে পার তা হলে তুমি ধরেই নেবে, ওটাই তোমার জায়গা আর

জায়গায় থাকার জন্য সবসময়ই চেষ্টা চালিয়ে যাবে। কিন্তু অভ্যাসটা যদি চার-পাঁচ নম্বরে থাকাতেই আটকে যায় তা হলে উপরে ওঠার চেষ্টাটাও বন্ধ হয়। বাংলার ক্রিকেটের যা হয়েছে।' এই বলে অরুণ সেনের মনে হল অল্পবয়সী ছেলের কোমল মনের উপর বোধহয় অযথা চাপ তুলে দিলেন। তাই যোগ করলেন, 'আবার সবসময় সবাই যে জেতে তাও নয়। ম্যাচ হেরে গেলেই যে পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে তাও নয়। সবথেকে বড় কথা হল, চেষ্টা করে যাওয়া। হারো বা জেতো, তুমি জানবে তুমি চেষ্টা করেছিলে।'

তনিমা ইস্ত্রি-করা জামা-প্যান্ট সযত্নে ভাঁজ করে ছোট একটা সুটকেসে রাখছিলেন। তাই দেখে অন্তু বলেছিল, 'যেন লর্ডসে খেলতে যাচ্ছি, মা এমন ভাবে সুটকেস সাজাচ্ছে না! আরে এটা আন্ডার-ফিফটিন বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির খেলা।'

'তুই তো একদিন লর্ডসেও খেলতে যেতে পারিস।'

'ওরেব্বাবা! লর্ডসে?' মায়ের দিকে তাকিয়ে অন্তু এমন মুখ করল যেন একদলা তেঁতুল মুখে দিয়ে ফেলেছে। 'বিল্ডিং ক্যাসল ইন দ্য এয়ার? স্বপ্নটপ্ন পরে দেখব, আগে তো এই ট্রফিটা জিতি।'

'পরে কেন দেখবে? দেরি করে দেখলে কাজে নামতেও দেরি হয়ে যাবে। আকাশে প্রাসাদ বানানোটা মোটেই বোকাদের কাজ নয়। আজ থেকে প্রায় একশো চল্লিশ বছর আগে হেনরি ডেভিড থরো নামে এক আমেরিকান প্রকৃতিপ্রেমী দার্শনিক তাঁর বাড়ি থেকে দু' কিলোমিটার দূরে ওয়ালডেন নামে এক ঝিলের ধারে একটা ছোট্ট কাঠের ঘর, ছ' হাত বাই দশ হাত, তৈরি করে সেখানে কিছুকাল থাকেন। ঘরটা বানাতে খরচ হয়েছিল মাত্র আঠাশ ডলার। তারপর থরো লেখেন—' তনিমা মুচকি হেসে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী যেন লাইনটা?'

'যদি আকাশে প্রাসাদটা বানিয়ে ফেলেই থাক, তা হলেও সেটা ভেঙে পড়বে না, ওটা ওখানেই থাকবে। শুধু এইবার তুমি ওর নীচে ভিতটা তৈরি করে ফেলো।' অরুণ সেন তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে পালটা মুচকি হাসলেন। 'পরীক্ষায় পাশ তো?'

সেই ম্যাচের প্রথম দিনে মধ্যাঞ্চল আট উইকেটে ৩১৭ রান

তুলেছিল। মহম্মদ উসমানি তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ১৪৬ নট আউট থেকে যায়। অনন্ত ১৬ ওভার বল করে ৬৫ রান দিয়ে একটিও উইকেট পায়নি। অরুণ সেন মাঠের ধারে বসে খেলা দেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, উইকেটে পেস নেই, বল উঠছেও না, জোরালো বাতাসে সুইং করানো বল লাইনে থাকছে না, একটা রিটার্ন ক্যাচ ধরার চেষ্টায় মাটিতে ঝাঁপিয়ে অন্তু ডান কাঁধে চোট পেয়েছে, তা ছাড়া উসমানি ছেলেটির পেস বল খেলার টেকনিকটা ভাল। তাঁর আরও মনে হয়েছিল, মাঠের ধারে বাবাকে দেখে অন্তু যেন অস্বস্তিতে ভুগছিল।

পূর্বাঞ্চল জিতেছিল ম্যাচটা ছয় উইকেটে। মধ্যাঞ্চল ৩১৭-তেই ইনিংস শেষ করে পরের দিন। প্রথম ওভারেই অনন্ত চার বলে উইকেট দুটি পায়, উসমানিকে সে ইয়র্ক করে। জীবন গুহঠাকুরতা নামে একটি ছেলে প্রচণ্ড পিটিয়ে খেলে ১৭১ করায় পূর্বাঞ্চল ১৩ রান এগিয়ে যায় প্রথম ইনিংসে। দ্বিতীয় ইনিংসে মধ্যাঞ্চল ১৪৭ রানে সবাই আউট। অনন্ত পায় প্রথম তিনটি উইকেট। পূর্বাঞ্চল চার উইকেট হারিয়ে জিতে যায়, জীবন আবার ৫৩ রানের একটা প্রচণ্ড ইনিংস খেলে।

সেমি-ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চলের কাছে টসে হারে পূর্বাঞ্চল। ২৯৪ রানে ছিল জীবনেরই ৯১। অনন্তর সঙ্গে সপ্তম উইকেটে ৫৩ রান ওঠার পর জীবন রান আউট হয়েছিল। অরুণ সেন মাঠে গেছলেন কিন্তু নিজেকে ছেলের দৃষ্টির আড়ালে রাখেন। তিনি বুঝতে পারেন দোষটা ছিল অনন্তরই। দ্রুত দৌড়বার মতো পেশী ও ফুসফুসের ক্ষমতা তখন আর তার ছিল না বলেই অনন্ত দ্বিতীয় রান নিতে ইতস্তত করে জীবনকে ফেরত পাঠিয়েছিল। জীবন ক্রিজে ফিরতে পারেনি। রানটা কিন্তু নেওয়া সম্ভব ছিল। জীবনের পরপর দুটো সেঞ্চুরি পাওয়া আর হয়নি। অরুণ সেন ব্যথিত হন।

পশ্চিমাঞ্চলের ইনিংস যখন আট উইকেটে ২১১ তখন ম্যাচের সময় ফুরিয়ে যায়। ম্যাচের মীমাংসা হয়েছিল টস করে। অনন্ত ছয়টি উইকেট নিয়েছিল ৬০ রানে।

বাড়ি ফিরে আসার দু'দিন পর বিকেলে অনন্ত অবাক হয়ে দেখল, বাবা লোহার ভারী-ভারী চাকতি, পুলি আর লোহার দড়ি কিনে আনলেন। আর

একটা মোটা ক্যানভাসের ব্যাগ, যা পিঠে বেঁধে ছেলেরা বই নিয়ে স্কুলে যায়।

'জীবন গুহঠাকুরতার সেঞ্চুরিটা হল না তোমার জন্য কারণ তোমার শরীর আর বইতে পারছিল না বুট, প্যাড, ব্যাটের ভারসমে নিজের ওজন। রানিং বিটুইন দ্য উইকেট খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কাল থেকে তোমাকে সকালে আরও বেশি দৌড়তে হবে, ছ' মাসের মধ্যে অন্তত স্বচ্ছন্দে দিনে পাঁচ মাইলে পৌঁছনো চাই। এই ব্যাগে লোহা ভরে পিঠে বেঁধে পুশ-আপ আর কাঁধের কাছে ধরে সিট-আপ করতে হবে দু'বেলা। তোমার খাওয়ার চার্টও বদলাতে হবে। এই দ্যাখো সয়াবিন এনেছি। মাছ, মাংসটা খুব দরকারি নয়। লো ফ্যাট, হাই নিউট্রিশন ডায়েটের জন্য ডাল, তরিতরকারি, ফল আর দুধই তোমার প্রধান খাদ্য হবে। ভুসি-মেশানো আটার রুটি এখন থেকে আমরা সবাই খাব। খেতে খারাপ লাগবে, লাগুক, দু'দিনেই সয়ে যাবে। চকোলেট, আইসক্রিম, রসগোল্লা, সন্দেশ, যা কিছু চিনির জিনিস একদম ছোঁবে না। খাওয়ার ব্যাপারটা যেন বাঙালি ঘরের মতো না হয়, তা হলে কোনও দিনই তুমি মজবুত শরীর পাবে না।'

এরপরই অরুণ সেন একটু তীব্রস্বরে বলেছিলেন, 'ছ'টা উইকেট নেওয়ার জন্য নিশ্চয় তুমি প্রশংসা আশা করছ?'

অনন্ত তার বাবার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝেছিল তীক্ষ্ণ সমালোচনা এবার আসছে। সেটা নরম করে দেওয়ার জন্য সে বলে, 'এসব খেলায় ছ'টা কেন দশটা উইকেটেরও কোনও দাম নেই।'

'সে কী! রীতিমত একটা ম্যাচ খেলে তুমি এগুলো সংগ্রহ করেছ, খেলার অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগাতে পেরেছ, এটার দাম কি কম? আগের খেলায় একই মাঠে একই পিচ থেকে তুমি উইকেট পাওনি। কেন? অপ্রত্যাশিত অনেক কিছুই তো তুমি এরপর প্রতি ম্যাচেই পাবে—ফেদারবেড পিচ, ড্রপড ক্যাচেস, ব্যাড কণ্ডিশনস, ইনজুরি, আরও অনেক কিছুই, যার ফলে তোমার স্বাভাবিক ছন্দে তুমি বল করতে পারবে না। এজন্য তোমাকে ভাল বোলার হয়ে উঠতে হবে, আরও আরও ভালো, যাতে এইসব বাধাবিঘ্ন ছাপিয়ে যেতে পার, যাতে ভাঙা পা নিয়েও বল করে উইকেট পেতে পার এমনভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।'

'বাবা, আমি পরিশ্রম করলে ডেনিস লিলি বা অ্যান্ডি রবার্টসের মতো বোলার হতে পারব কি ? তুমি কি তাই মনে করো ?

'কেন পারবে না ! তোমার ট্যালেন্ট আছে তুমি কঠিনভাবে খাটতেও ইচ্ছুক । যে-কোনও বিষয়ে সাফল্য পেতে হলে যে তিনটি জিনিস দরকার, তার দুটো হল ওইগুলো । তৃতীয়টি হল, সাফল্যের জন্য প্রচণ্ড একটা খিদে থাকা দরকার । সাফল্যের মতো দুষ্প্রাপ্য কোনও-কিছু যখন আকাঙ্ক্ষা করবে তোমাকে তখন বাকি পৃথিবীকে পিছনে ফেলে দিয়ে সেটা ছিনিয়ে নিতে হবে । তোমাকে এও তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করতে হবে যে, তখন কোনও খাটুনিকেই আর কষ্টকর মনে হবে না, কোনও যন্ত্রণাই যথেষ্ট মনে হবে না, কোনও একাকিত্বই অসহ্য লাগবে না ।'

সেদিন সন্ধ্যায়ই বাড়ির সবজি বাগানে স্টাম্প পুঁতে পিছনে জাল খাটিয়ে অনন্ত বল করতে শুরু করল । বাইরের ইলেকট্রিক আলোটা যথেষ্ট জোরালো নয় তাই টেবল ল্যাম্পটাও আনা হয়েছে । দৌড়ে আসার জন্য তাকে বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে গিয়ে রাস্তার ওপার থেকে দৌড় শুরু করতে হচ্ছে । গুড লেংথে, অফ স্টাম্পের এক ফুট বাইরে খাতার একটা সাদা পাতা জমিতে চুলের কাঁটা দিয়ে আটকানো । দুটি মাত্র পুরনো বল । ওই কাগজে ফেলে বল কাট্ করিয়ে লেগ স্টাম্পে মারতে হবে ।

প্রায়ান্ধকার রাস্তা দিয়ে দুটি লোক যাচ্ছিল । তারা থমকে পড়ল ।

'দ্যাখ্ দ্যাখ্, কাণ্ডটা দ্যাখ ।'

'কী দেখব, ছেলেটার তেকাঠিতে বল লাগানো ?'

'আরে না, জালের কাছে, বোধহয় মা হবে, বল কুড়িয়ে কেমন হাত ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেরত পাঠাচ্ছে দ্যাখ !'

সেবার বাঙ্গালোরে ভারতের ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ১৫ বছরের কম বয়সীদের জন্য এক মাসের কোচিং ক্যাম্প করে । ভারতের নানা জায়গা থেকে একুশটি ছেলে সেজন্য নির্বাচিত হয় । বাংলা থেকে শুধু অনন্ত ।

ট্রেনে মাদ্রাজ । সেখানে ট্রেন বদল করে বাঙ্গালোর । দুটো রাত ট্রেনে থাকতে হবে । রওনা হবার দিন সকালে অরুণ সেন ছেলেকে একশোটি টাকা দিয়ে বলেন, 'ট্রেনে কিছু কিনে খাবে না । তোমার মা যা দিয়েছে

তাতে বাঙ্গালোর পর্যন্ত চলে যাবে। ফেরার সময় শুকনো কিছু কিনে নেবে। ট্যাক্সি বা রিকশা ভাড়ার জন্য খরচ করেও হাতে কিছু থাকবে। মনে রেখো তুমি এক্সকার্শনে যাচ্ছ না। অনেক কিছুই তুমি জানো না, অনেক কিছু শেখার বাকি। সেইসব জানার, শেখার সুযোগ এসেছে। সুযোগটা কাজে লাগাও। নিজেকে নিজে ঠেলে তুলতে হবে। বাবা-মা চিরকাল তোমাকে গাইড করবে না। একটা সময় আসবে যখন নিজেকেই নিজে চালনা করতে হবে। ক্রিকেট খেলাটা হল টাইটরোপ ওয়াকিং। দুটো পাহাড়ের চুড়োর মাঝে দড়ি-বাধা তার উপর দিয়ে হাঁটা। যদি ব্যর্থ হও, পড়ে যাবে। আর পড়লেই, মৃত্যু। সুতরাং তোমাকে সেরা হতেই হবে যদি টেস্ট খেলতে চাও।'

'চিঠি দিবি তো?'

অনন্ত মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু হেসেছিল। বাঙ্গালোর থেকে সে চারখানা চিঠি লিখেছিল। শেষ চিঠিতে সে বাবাকে লেখে:

এখানে এসে আমার যে কী উপকার হল সেটা সামনের সিজনেই আমি বুঝিয়ে দিতে পারব। আমার দু-তিনটে ভুল শুধরে নিচ্ছি, বিশেষ করে ফলো থ্রু-র। পুরনো বলেও সুইং করাতে পারি দেখে সবাই অবাক হয়েছে। আমি যখন বললাম, রাতে বাড়ির বাগানে প্র্যাকটিস করি, ওরা তাই শুনে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ভিডিও ফিল্মে বড়-বড় বোলারদের অ্যাকসন দেখলাম। লিলি, টমসন, হোল্ডিং, রবার্টস, হ্যাডলি, কপিলদেব, উইলিস। তা ছাড়া টুম্যান আর লিন্ডওয়ালেরও ক্লিপিং দেখেছি।

পরপর দুটো ম্যাচ হল, আমাদের মধ্যেই দুটো টিম করে। দুটোতে আমি তিন আর পাঁচ, মোট আটটা উইকেট নিয়েছি। উসমানি দু'বারই আমার অপোনেন্ট টিমে ছিল। দু'বারই আমার অফ কাটারে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে এল বি ডব্লু হয়ে আউট হয়েছে। ও আমার উপর বেশ চটেছে এজন্য। আমাকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু আমি কী করতে পারি? শুনলাম ও নাকি বলেছে, এরপর কোনও ম্যাচে পেলে আমার বল ছাতু করবে। উসমানির কিন্তু সত্যিই ভাল ব্যাট। স্টাইলিসও। মধ্যপ্রদেশ রঞ্জি টিমে এবারই আসত যদি না আঙুলে ইনজুরি হত। টেস্ট ও খেলবেই।

আর একজন পেসারকে আমার ভাল লাগল। পঞ্জাবের দেশরাজ আনোখা। আউট সুইংটা আমার থেকেও ভাল। বলের পেস আমারই মতো। ব্যাট করে খুব স্বচ্ছন্দে আর ছয় মারতে ওস্তাদ। টেস্ট টিমে আসার জন্য এর সঙ্গেই

আমাকে কমপিট করতে হবে মনে হচ্ছে। এজন্য আমাকে ব্যাটিংয়ের উপর আরও জোর দিতে হবে। দুটো ম্যাচের প্রথমটায় আমার ব্যাট করার সুযোগ আসেনি। দ্বিতীয়টায় ২৩ নট আউট ছিলাম। আমি যে অনেকের থেকে ভাল ব্যাট করতে পারি সেটা এখানে প্রমাণ করা গেল না। তবে আর একটা ম্যাচ খেলা হবে কর্ণাটকের ভেটারেনদের সঙ্গে। এই একটা ব্যাপারে আনোখা আমার থেকে এগিয়ে রয়েছে। ছেলেটা রগচটা কিন্তু সরল। আমার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। স্টেডিয়ামে আমাদের খাট দুটো পাশাপাশিই। একদিন রাতে কথায়-কথায় বলল, প্রত্যেক ব্যাটসম্যানকেই ও শত্রু বলে ভাবে। খেলার বাইরেও কোনও ব্যাটসম্যানের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায় না। তা হলে নাকি ওদের সম্পর্কে মন নরম হয়ে যাবে। অদ্ভুত, তাই নয়? সবসময় ও ঘৃণা করে ব্যাটসম্যানদের। ওর যুক্তি হল, তা হলে বল করার সময় বাড়তি একটা তেজ ও পায়, কখনও ঝিমিয়ে পড়ে না। আমাকে পরামর্শ দিল, 'তুমিও হেট করো ব্যাটসম্যানদের। দেখছ তো তোমাকে কেমন হেট করে উসমানি। ও ঠিক বদলা নেবে তোমাকে।' আনোখাকে আমি বললাম, 'তুমি আমার রাইভাল। ও শুনে হোহো করে হাসল। বলল, 'অনন্ত তোমাকে মোটেই রাইভাল ভাবি না। একটা টিমে বল ওপেন করতে দু'দিক থেকে দুটো লোক দরকার। ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিম হলে তো চারটে লোক চাই। আমাদের দেশে চারটে কোথায়, শুধু তো একজনই এখন টেস্ট ক্লাসের মিডিয়াম ফাস্ট বোলার, সে হল দুয়া। চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই আমি টেস্টে বল ওপেন করব আর অন্য দিক থেকে করবে তুমি।' আনোখার কথা শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কি বিশ্বাস নিজের সম্পর্কে!

এখানে খাঁটি চন্দন কাঠ পাওয়া যায়, চন্দন পাউডারও। কাঠের নানারকম মজার মজার পুতুলও দোকানে দেখলাম। মার জন্য চন্দন কাঠ, পাউডার, ধূপ আর তোমার জন্য পুতুল নিয়ে যাব।

অনন্ত কলকাতায় ফেরার আগের দিন যখন বাঙ্গালোরে মহাত্মা গান্ধী রোডে কাবেরি থেকে চন্দন কাঠ কিনছিল সেই সময় প্রায় দেড় হাজার মাইল দূরে কলেজে ক্লাস নিতে-নিতে অরুণ সেন হঠাৎ মাথায় তীব্র যন্ত্রণা বোধ করেন। সংজ্ঞা হারিয়ে তিনি চেয়ার থেকে পড়ে যান। ডাক্তার আসেন। কাছাকাছি এক নার্সিং হোমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। জ্ঞান আর ফেরেনি এবং সন্ধ্যায় তিনি যখন মারা যান তনিমা সেন তখন তাঁর হাত ধরে ছিলেন।

॥ চার ॥

প্রিমিয়ারটা বাড়ির সামনে থামিয়ে, একবার হর্ন বাজিয়ে জীবন জানিয়ে দিল সে এসেছে।

চাতালের একধারে দেওয়ালে লাগান পুলি টেনে অনন্ত তখন ব্যায়াম করছিল। নভেম্বরেও দরদর করে ঘাম ঝরছে তার গলা ঘাড় বেয়ে। কাঁধের এবং পিঠের ফুলে ওঠা পেশীগুলো ঘামে ঝকঝক করছে। হর্নের আওয়াজে তার ব্যায়াম বন্ধ হল না।

জীবন চাতালের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মিনিটখানেক অপেক্ষা করে বলল, "আজকের খেলাটা দেখেছিস ?"

"প্রথম এক ঘণ্টা, তারপরই লোডশেডিং হল।"

"আজকের রেজাল্ট জানিস ?"

পুলি ছেড়ে দিয়ে, দু' হাতের তালু ঘষতে-ঘষতে অনন্ত বলল, "টি-এর চল্লিশ মিনিট পর কারেন্ট এল। মাঝে কি হল জানি না। তবে স্কোরগুলো জানি। ফ্যান্টাস্টিক ম্যাচ হবে।"

গত সিজনে শিলিগুড়িতে একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অনন্ত ফাইনালে খেলতে গেছল সেখানকার এক ক্লাবের পক্ষে। কড়ার ছিল, তাকে একটা সাদা-কালো টিভি সেট দিতে হবে। সে আটটা উইকেট ১১ রানে পায়। বাকি দু'জন রান আউট হয়েছিল। সেটটা দালানে খাবারের টেবলের পাশে রাখা। খবরের সময় এবং বিশেষ কোনও অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য সময় সেট বন্ধই থাকে। দায়সারা লঘু ব্যাপার মা ও ছেলের কেউই পছন্দ করে না।

"ম্যাচটাই শুধু নয়, মাঠের বাইরেও কিছু ফ্যান্টাস্টিক ব্যাপার হবে বলে মনে হচ্ছে। তুই আজকের আনন্দবাজারটা পড়েছিস ?"

"পড়েছি।"

"তোর কি মনে হয় না, বোর্ডের সঙ্গে প্লেয়ারদের একটা প্রচণ্ড গণ্ডগোল ঘনিয়ে আসছে ? একটা এসপার-ওসপার এবারই হয়ে যাবে ?"

"পাণিগ্রাহি আর হরিহরণের কথা থেকে তাই-ই যেন মনে হচ্ছে। এই সিরিজেই ওদের টিট করব বলেছে যখন, মনে হয় বোর্ড কিছু একটা করবে।"

"কী করবে ?" জীবন বাঁ পকেট থেকে লবঙ্গ বার করে দাঁতে কাটল,

"আজ ইন্ডিয়া টিমের যা পারফরম্যান্স তাতে ওদের গায়ে হাত দিতে বোর্ড সাহস পাবে ভেবেছিস ?"

"খেলার এখনও চারদিন বাকি।" অনন্ত হাত বাড়াল। "একটা লবঙ্গ দে।"

এই উইকেটে খেলা পাঁচদিন যাবে না, থার্ড কি ফোর্থ ডে লাঞ্চ পর্যন্ত, তার বেশি নয়।"

"কে জিতবে ?" লবঙ্গটা চিবোতে-চিবোতে অনন্ত তড়াক করে লাফিয়ে উঠে "ফুলু কোথায় যাচ্ছিস" বলে চাতাল থেকে দৌড়ে নেমে গেল। পাঁচিল দিয়ে একটা সাদা বেড়াল গুটি-গুটি যাচ্ছিল। অনন্ত সেটাকে ধরে নিয়ে এসে চেয়ারে বসল। ফুলুকে কোলে বসিয়ে তার গলা চুলকে দিতে দিতে বলল, "ম্যাচটা এমন জায়গায় এসে আজ দাঁড়াল, তাতে বলা শক্ত কে জিতবে।"

"আমি চাইছি ইন্ডিয়া হারুক।"

"সে কী ? না, না, আমি চাইছি জিতুক।"

"না হারলে বোর্ড কোনও অ্যাকশনই নিতে পারবে না।"

"সেজন্য দেশকে হারতে হবে ?"

"একটা টেস্ট হারলে কিছু আসে যায় না। গণ্ডা-গণ্ডা টেস্ট তো আমরা হেরেছি, তার সঙ্গে নয় আর একটা যোগ হবে। কিন্তু তাতে লাভ হবে এই যে, প্লেয়াররা যেরকম ইনডিসিপ্লিনড হয়ে পড়েছে, বোর্ডকে পর্যন্ত জোট বেঁধে শাসাতে শুরু করেছে, সেটা তা হলে বন্ধ করা যাবে। আর এখনই বন্ধ না করলে এর জের পরের জেনারেশনগুলোকেও প্রভাবিত করবে।"

"কিন্তু প্লেয়াররা যা চায় সেটা কি খুব অনায্য ?"

"টাকা ?"

"হ্যাঁ। তাদের ভাঙিয়ে লক্ষ-লক্ষ নয়, কোটি টাকার উপর বোর্ড তহবিল গড়েছে। অবিরত তাদের দিয়ে টেস্ট ম্যাচ, বছরে তিনটে করে সিরিজ খেলিয়েছে, অসংখ্য ওয়ান ডে ইন্টারন্যাশনাল। মুখের রক্ত তুলে তারা টাকা এনে দিয়েছে বোর্ডকে। জীবন, আগে ক্রিকেটাররা কত বছর ধরে, কটা করে টেস্ট খেলত ?"

"এখনকার থেকে বেশি বছর ধরে কিন্তু কম টেস্ট।"

"ব্রাডম্যানের কথা বাদই দিচ্ছি, কুড়ি বছরে মাত্র বাহান্নটা ! হ্যামন্ড, উলি হবস্‌দের ফার্স্টক্লাস কেরিয়ার কত বছর ধরে বলত ? এক-একজনের প্রায় তিরিশ বছর করে। তার মধ্যে হ্যামন্ড পঁচাশিটা, উলি চৌষট্টিটা, হবস একষট্টিটা টেস্ট খেলেছে। আমাদের মার্চেন্ট, মুস্তাক, মাঁকড়, হাজারেরা কত বছরে ক'টা টেস্ট খেলেছে ? পঙ্কজ রায় দশ বছরে বিয়াল্লিশটা, ফাড়কর দশ বছরে একত্রিশটা, মাঁকড় বারো বছরে মাত্র চুয়াল্লিশ..."

"হয়েছে, হয়েছে, রেকর্ড চালানো বন্ধ করো। আমি মানছি এখনকার সুপারস্টাররা দশ বছরেই সত্তর-আশিটা টেস্ট, একশোর উপর ওয়ান ডে খেলে নিজেদের জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলছে কিন্তু এর সঙ্গে এইসব বিশৃঙ্খলা, নিয়ম ভেঙে ফেলা, ঔদ্ধত্য দেখানোর সম্পর্ক কি ? খেলছে বেশি, টাকাও তেমনি বেশি পাচ্ছে। আনন্দবাজারের ওই লেখাটার এক জায়গায় রয়েছে প্লেয়াররা বিদ্রোহ করবে, বোর্ডকে চিঠি দিয়ে তারা জানাবে ভার্দেকে রোজ খবরের কাগজে লিখতে দিতেই হবে নইলে..."

"ব্ল্যাকমেইলিং ?"

"তা ছাড়া আর কি !"

"আমি তা মনে করি না।" অনন্ত এই বলে ফুলুকে কোল থেকে নামিয়ে দিল। ছাড়া পেয়ে সে আড়মোড়া ভেঙে ল্যাজ তুলে গদাই লশকরি চালে ভিতরে চলে গেল।

"বোর্ড যদি শোষকের মতো কাজ করে, তার প্রতিবাদ হবে না ?" অনন্ত এবার উত্তেজিত গলায় বলল, "যদি সাহস থাকে বোর্ড এদের বরখাস্ত করছে না কেন ?"

"হয়তো সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে আর সেই সময়টা বোধহয় ঘনিয়েও আসছে।" জীবন ঝুঁকে পড়ল। গলা নামিয়ে বলল, "অন্তু তা হলে তোর সুযোগ এলেও আসতে পারে।"

"কী বললি ?" ঝাঁকুনি খেয়ে অনন্তর মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে এল। "আমার সুযোগ কি করে আসবে ?"

"সাত-আটজন যদি বাদ পড়ে তা হলে নেক্সট যারা জায়গা নেবার জন্য রয়েছে তাদের মধ্যে তুইও পড়িস। উসমানি আর নবর সই করেছে, ওরা থাকবে। মধ্যপ্রদেশ ছেড়ে উসমানি কর্ণাটকে এসে খুঁটি পেয়েছে

হরিহরণকে। দুয়া আর কাপুরের জায়গায় আসবে আনোখা আর তুই। দলিপ ট্রফিতে, ইরানি ট্রফিতে তোর এবারের পারফরম্যান্স যথেষ্ট ভাল। রঞ্জিতে গতবার তোর আটত্রিশটা উইকেট! অন্তু আজ ইন্ডিয়ান বোলাররা যে ভাবে হিটব্যাক করেছে তাতে মনে হয়েছে তোর আর আশা নেই টেস্ট খেলার। কিন্তু এখানে আসার পথে মনে হল, আশা এখনও আছে যদি ইন্ডিয়া এই টেস্ট হারে। সেইজন্যই আমি চাই ইন্ডিয়া হারুক।"

এই সময় রাস্তা থেকে একটি লোক চেঁচিয়ে বলল, "এই যে বাড়িতেই আছিস দেখছি!"

"আরে শচীনদা আপনি, কি ব্যাপার?" অনন্ত এগিয়ে গেল ফটকের দিকে।

"দু'বছর আগে একবার এসেছিলুম আর আজ। জীবনও রয়েছে দেখছি।" শচীনদা নামক টাকমাথা, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, লম্বা লোকটি চাতালে উঠে চেয়ারে বসল। বান্ধব সমিতির সহ সচিব গত পনেরো বছর ধরে।

"আজ নেটে যাসনি?"

"টিভি দেখব বলে আর বেরোইনি। কালও যাব না। খেলাটা দেখতে হবে।"

"খেলাটা জব্বর জমেছে, প্রথম দিনেই আঠারোটা উইকেট। চা খাওয়া।"

অনন্ত বাড়ির ভিতরে গেল। জীবন রাস্তার দিকে তাকিয়ে, দূরে দেখল তনিমা আসছেন। কালো পাড়ের সাদা তাঁতের শাড়ি, বুকের কাছে ধরা চামড়ার ব্যাগ। কালো ফ্রেমের চশমা। ছিপছিপে, দীর্ঘ, সমুন্নত দেহের গড়নের মধ্যে অনন্তর আদলটা খুব স্পষ্ট।

"শচীনদা আপনাকে অনেকদিন পর দেখছি।"

"আমিও তোমাকে। সেই অ্যাকসিডেন্টের পর তুমি আর একদিনও ময়দানে পা দাওনি। তিনবছর বোধহয়।" শচীনদা ব্যথিত চোখে জীবনের ডান হাতটার দিকে তাকালেন। অস্ফুটে একবার বললেন, "কপাল!"

অনন্ত ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। 'কপাল' প্রসঙ্গটা যাতে না গড়ায় তাই জীবন তাড়াতাড়ি বলল, "শচীনদা আজ খেলা দেখলেন?"

"দেখব কোত্থেকে, অফিসে কি টিভি আছে?"

"আপনার কি মনে হয় পিচ আন্ডার প্রিপেয়ার্ড না একেবারেই আন প্রিপেয়ার্ড ?"

"কে জানে কী করেছে, ওরে অন্তু যে জন্যে আসা, নারানদা কালই তোকে সি এ বি-তে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন, খুব জরুরি। দুপুরে আমাদের টেন্টে লোক দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন, তোকে যেন এক্ষুনি, আজকেই জানিয়ে দেওয়া হয়।"

"কী ব্যাপার ? কী জন্য ?" অনন্তর সঙ্গে-সঙ্গে জীবনও অবাক হয়ে শচীনদার দিকে তাকিয়ে থাকল। নারায়ণ সরকার সি এ বি-র সেক্রেটারি। রাশভারী লোক। অপ্রয়োজনে কোনও কাজ করেন না। বাজে কথা বলেন না। তনিমা সেই সময় বাড়িতে ঢুকলেন। জীবন দাঁড়িয়ে উঠল।

"মা ভাল আছেন ?"

"হ্যাঁ। বলছিলেন আপনি কবে আসবেন।"

"যাব। সময় আগে যেমন ছিল এখন তো আর ঠিক ততটা পাই না। যাব একদিন।" তনিমা ভিতরে গেলেন। স্বামী মারা যাওয়ার পর আর্থিক অনটনে পড়েছিলেন। সেটা কাটাতে প্রাইভেট কোচিং শুরু করেছেন। দুটি মেয়েকে তাদের বাড়িতে গিয়ে সপ্তাহে দু'দিন পড়ান আর পাঁচটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে সন্ধ্যায় এই চাতালেই শতরঞ্চি পেতে বসেন। সপ্তাহে চারদিন। সকালে তিনি অনন্তর পড়ায় সাহায্য করেন। সামনের বছর সে বি-এসসি ডিগ্রি পরীক্ষায় বসবে।

"অন্তু।"

ভিতর থেকে চাপা গলায় এক প্রৌঢ়া ডাকলেন। অনন্ত ভিতরে গেল এবং ট্রে হাতে ফিরল। চায়ের সঙ্গে রয়েছে চানাচুর।

"নারানদা কেন ডেকেছেন, কিছু তো বুঝতে পারছি না।" অনন্ত দু'জনের মুখের দিকে তাকাল।

শ্যামবাজার মোড়ে শচীনদাকে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরেই টেলিফোন ডাইরেক্টরি থেকে নম্বর নিয়ে জীবন ফোন করল নারায়ণ সরকারের বাড়িতে।

"আজ সকালে দিল্লি থেকে হরিহরণ ফোন করেছিল। অনন্তকে অতি অবশ্য হায়দরাবাদ যেতে বলেছে। ওখানে আন্ডার টোয়েন্টি ফাইভের

সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ানদের খেলা এই টেস্টের তিনদিন পর। টেস্ট যেদিন দিল্লিতে শেষ হচ্ছে সেইদিনই অনন্ত যেন হায়দরাবাদ পৌঁছয়। প্লেনের টিকিট আজই করিয়ে রেখেছি, কাল এসে যেন নিয়ে যায়।"

"হঠাৎ এমার্জেন্সি কল, ব্যাপার কী? টিম তো সাতদিন আগেই অ্যানাউন্সড হয়ে গেছে, চোদ্দজনে অন্তু নেই। তা হলে? এখন অদলবদল করতে পারে শুধু সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান, বোর্ড সেক্রেটারির কি সে-ক্ষমতা আছে?"

"আছে কি নেই সে-সব প্রশ্ন এখন অবান্তর। বোর্ড চাইলে সিলেকশন কমিটি আমাকেও খেলাতে পারে। একটা কিছু উদ্দেশ্য নিয়েই অনন্তকে ডেকেছে। কথা বলে মনে হল, বোর্ড কিছু একটা করতে যাচ্ছে। হরিহরণ বারবার বলল, 'দিস আন্ডার টোয়েন্টি ফাইভ ম্যাচ উইল বি ভেরি-ভেরি ক্রুসিয়াল ফর আস অ্যান্ড অলসো ফর সাম অব দ্য ইয়ং স্টারস। ইফ দে ক্যান কাম আউট উইথ ফ্লাইং কলারস...' এর বেশি আর কিছু বলল না। তবে আমার মনে হয় বোর্ড এবার চরম কোনও ব্যবস্থা নেবে।"

"গোটা টিমটাকে কি স্যাক করবে?"

ওধারে কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা জীবনের হৃদপিণ্ডকে টেনে গলার কাছে নিয়ে এল।

"বোধহয়।"

॥ পাঁচ ॥

প্রথম দিনের খেলা সম্পর্কে ভারত অধিনায়ক ভার্দের বক্তব্য ইন্টারন্যাশনাল ফিচার্সের মাধ্যমে ভারতের কয়েকটি খবরের কাগজে ছাপা হল। শুরুতে বিস্ময় প্রকাশ—পিচের খামখেয়ালির কারণ দর্শাতে না পারার জন্য অসহায়তা জানিয়ে মৃদু সমালোচনা নিজের ব্যাটসম্যানদের, প্রশংসা লটন ও ব্রাইটকে তারপর ম্যাচে ভারতকে ফিরিয়ে আনতে দুয়া ও কাপুরের চেষ্টার জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, দ্বিতীয় দিন, ভারতকে খুব মন দিয়ে ও সাহস ভরে ব্যাট করতে হবে এটা মনে করিয়ে দিয়ে অবশেষে ভার্দে আশা করেছে উইকেটের অবনতি ঘটবে। অস্ট্রেলীয়দের তা হলে স্পিনের মোকাবিলা করতে হবে চতুর্থ ইনিংসে এবং

তারা যে ধারাদ্ধার ও পুষ্করনার মতো ওয়ার্লড ক্লাস ল্যাটা স্পিনার ও ফরজন্দের মতো ক্লাসিক অফ স্পিনারকে সামলাতে হিমসিম খাবে সেটা না বললেও চলে। ভারতের এখন টার্গেট অস্ট্রেলীয় প্রথম ইনিংস দেড়শোর মধ্যে বেঁধে ফেলে কমপক্ষে দুশো পঁচিশ রানে দ্বিতীয় ইনিংসে নিজেদের এগিয়ে দেওয়া। অস্ট্রেলীয়দের এই উইকেটে চতুর্থ ইনিংসে স্পিনাররা দুশো রানের মধ্যে শেষ করে দিতে পারবে।

জীবন এটা জানে, ভার্দের ম্যাচ লেখাটা যতই বোকার মতো হোক লোকটা কিন্তু মোটেই তা নয়। আশিটার বেশি টেস্ট খেলেছে সুতরাং খুব ভালই জানে দুশো পঁচিশ রান লিড নেওয়া এই উইকেটে খুবই শক্ত কাজ। কিন্তু এমনভাবে লিখেছে যেন ইচ্ছে করলেই করে ফেলা যায় যদি ভারতের ব্যাটসম্যানদের অ্যাপ্লিকেশনটা আর একটু বেশি হয়।

কিন্তু জীবনকে ধাঁধায় ফেলল যে ব্যাপারটি, সেটি হল, এমন একটা লেখার কি খুবই দরকার আছে, ভারত অধিনায়কের ? অতি সাধারণ মানের ম্যাচ-রিপোর্ট যেন। বিপক্ষ অধিনায়করা লিখে চাপ সৃষ্টি করতে পারে যদি তা হলে ভারতের অধিনায়কই বা লিখবে না কেন, এই যুক্তির পক্ষে কোনও সমর্থনই সে ভার্দের লেখায় খুঁজে পেল না। রিচার্ড বোলান কোথায় কোন্ কাগজে লিখে চাপ সৃষ্টি করেছে কি না জীবন তা এখনও জানে না কিন্তু ভার্দে যে বোর্ডের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল পার তো ব্যবস্থা নাও— এটা সে এবং সারা দেশই জেনে গেল।

কাগজে আর একটা ছোট্ট খবর তার চোখে পড়ল। বিরতি দিবসে ভার্দের লেখা দ্বিতীয় বইটির আনুষ্ঠানিক বিক্রি শুরু হবে। তাতে নাকি কয়েকজন সহ খেলোয়াড় ও বোর্ড সম্পর্কে তিক্ত কিছু মন্তব্য আছে বলে জানা গেছে।

আজও জীবন টিভি সেটের সামনে কাগজ কলম নিয়ে বসল। তার উৎকণ্ঠা লটন বা ব্রাইটকে নিয়ে নয়, ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে দেড়শোর মধ্যে আউট হোক এটাই সে চায়। সারা দেশ হতাশ হোক, বিরক্ত হোক ভার্দের এই দলটা সম্পর্কে। ক্রিকেট বোর্ড বরখাস্ত করুক দলটাকে। তা হলে অন্তর টেস্ট খেলার সুযোগ আসবে। খুব সহজ ও সরল তার অঙ্কটা। কিন্তু তার আগে হায়দরাবাদী ম্যাচটা ওকে উতরোতে হবে। ওটাই ওর

জীবনের বড় ট্রায়াল।

অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয়ে গেল ১২৮ রানে। রজার্স ৪৮, নট আউট থেকে গেল। ভারত পিছিয়ে রইল ৫৪ রানে। শেষ উইকেট দুটি নিয়েছে দুয়া। তার বোলিং দাঁড়াল ৫৫ রানে ছয় উইকেট ১৪·১ ওভার বল করে। ওকে সামনে রেখে তালি দিতে-দিতে ভারত দল মাঠ থেকে বেরোল।

ছয় রানের মধ্যেই ড্রেসিংরুমে ফিরে এল পিল্লাই (৫) আর উসমানি (০)। লটনের তৃতীয় ওভারে দুজনই বোল্ড হল ইয়র্ককারে। নবর আর ভার্দে লাঞ্চ পর্যন্ত আর কোনও উইকেট পড়তে দেয়নি। দুই উইকেটে ৬৬। সব থেকে অবাক হবার মত ব্যাপার, উইকেট একেবারে স্বাভাবিক। ফিরোজ শাহ কোটলার চিরন্তন রীতি বজায় রেখে, অলস ঘুমে মগ্ন। কেউ বিশ্বাসই করবে না এই উইকেটেই চব্বিশ ঘণ্টা আগে ভারত লাঞ্চে ছিল সাত উইকেটে ৫৮!

জীবন বিড়বিড় করল, "ক্রিকেট! কিচ্ছু বলা যায় না। সত্তরেও অল আউট হয়ে যেতে পারে।"

লাঞ্চের পর নবর স্ট্রেট ড্রাইভে তিন রান পেয়ে লটনের পরের বলে গালিতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেল। ৭৬ বল খেলে ৪০ রান করেছে। ভার্দে তখন ১৮ রানে। তিন ওভার পর পুষ্করনা প্রথম স্লিপে ধরা পড়ল ব্রাইটের বলে। ৮২-৪ ; ভার্দে ২৬ রানে। ধীরে-ধীরে সে নিজেকে থিতু করছে, ব্যস্ততা নেই। উইকেটের এবং বোলিংয়ের ঝাঁঝ মরে গেছে। বড় রান পাবার গন্ধ পেয়েছে ভার্দে, তা ছাড়া টেস্ট ক্রিকেটে নিজের পাঁচ হাজার রান পূর্ণ করার সম্মানটাও আর দু'কদম দূরে অপেক্ষা করছে। ভার্দেকে এখন আউট করতে হলে অসম্ভব ভাল বল দরকার।

অ্যামরোজকে অফ ড্রাইভে বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে ভার্দে ৩৯ রানে পৌঁছে হাততালি পেল। পাঁচ হাজার রান পূর্ণ হল। পরের বলে এক রান নিয়ে সে ভোজানিকে আনল অ্যামরোজের সামনে। ম্যাচের বিবরণ দেওয়া বন্ধ করে বিশেষজ্ঞ লোকটি তখন ভার্দের ব্যাটিংয়ের গুণাবলী জানাতে ব্যস্ত। তার মধ্যেই হঠাৎ চমকে উঠে বললেন, 'ভোজানির মুখে বল লেগেছে।'

জীবন দেখল, ফিল্ডাররা ছুটে গেছে। ভোজানি মাটিতে শুয়ে। তাকে

ঘিরে একটা জটলা। হাত নেড়ে কয়েকজন ডাকছে। ডাক্তার ছুটে গেল, সঙ্গে আরও দু'জন। মুখে রুমাল চেপে ধরে ভোজানিকে মাঠের বাইরে আনা হচ্ছে। বোর্ডে ওর রান তখন ১০। ভারতের ১০৫। এই ম্যাচে আর ব্যাট করতে পারবে কিনা সেটা এখন বলা যাচ্ছে যাচ্ছে না। তাকে নিয়ে পাঁচজন ভারতীয় মাঠ ছেড়ে এল। কাপুর ব্যাট করতে নামার দু' ওভার পরই চা-এর জন্য বিরতি হল।

ঝড়ের গতিতে কাপুর ৪৪ রান করে এল বি ডব্লু হল। ভার্দে তখন ৬১-তে। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত সেই সময় ১২৪ রানে এগিয়ে। গুপ্তার ব্যাটিং থেকেই বোঝা গেল উইকেট যদি আবার আড়মোড়া না ভাঙে তা হলে দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা বিপন্ন হবে না। ২১০-৫, দ্বিতীয় দিনের শেষে। ভার্দে দুশো বল খেলে ৭৪, গুপ্তা ১৮। ভারত ১৫৬ রানে এগিয়ে। কমেন্টেটর জানালেন, ভোজানির বাঁ চোখের নীচে সাতটা সেলাই হয়েছে, হাড় ভাঙেনি, কাল বিশ্রাম দিন, পরশু দরকার হলে ব্যাট করবে।

খেলার তৃতীয় দিনে লাঞ্চের এক ঘণ্টা পর ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ৩২৮ রানে শেষ হল। অস্ট্রেলিয়াকে ম্যাচ জিততে হলে ২৭৫ রান তুলতে হবে, সময় আছে দেড়দিন। তারা জিততেও পারে, হারতেও পারে।

ভার্দে সেঞ্চুরি করেছে। ১০২-এ পৌঁছে অ্যামরোজের শর্ট-পিচ বল মিড-উইকেটের হাতে পাঠায় পুল করে। ফেরার সময় ক্যামেরা তার মুখটা কিছুক্ষণ ধরেছিল। জীবনের মনে হল উদ্বেগের ছায়া মুখে পড়েছে। পুলটায় সময়-বিচারে ভুল হয়েছিল। কারণ, উইকেট ঝিমিয়ে মন্থর হয়ে গেছে। বলটা প্রত্যাশামতো গতিতে আসেনি, ওঠেওনি। ভার্দের মুখে মনে হল যেন প্রশ্ন : স্পিনাররা কি ২৭৫ রান তোলা ঠেকাতে পারবে ?

পারেনি।

তার আগে খবরের কাগজে সংবাদ হল ভার্দের বইয়ের কয়েকটা প্যারাগ্রাফ। তাতে সে এক জায়গায় লিখেছে : "ক্রিকেটারদের দমিয়ে রাখার, শাসন করার নতুন নতুন উদ্ভাবনী-কৌশল আবিষ্কার করতেই বোর্ডের কর্তারা যাবতীয় শক্তি ও সময় ব্যয় করেন। খেলোয়াড়দের লেখালেখি, লোগো-পরা এসবে নাকি ক্রিকেটের মর্যাদা ও গুণের হানি

হচ্ছে। আসলে লোগো নিয়ে মাথাব্যথার কারণ হল, খেলোয়াড়রা বিশেষ কোনও কোম্পানির লোগো পরলে অন্য স্পনসররা তেমন উৎসাহিত হন না। এতে বোর্ড ও আয়োজক সংস্থাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে টিভি কর্তৃপক্ষও চাপ সৃষ্টি করে। টেনিসের দিকে একবার তাকান তো আমাদের বোর্ড কর্তারা! উইম্বলডনে খেলোয়াড়রা যে হারে লোগো ব্যবহার করেছেন, তাতে গোটা ব্যাপারটাকে একটা ইন্ডাস্ট্রি বললেও অত্যুক্তি হয় না। টেনিসের জন্য এক নিয়ম, আর ক্রিকেটের জন্য অন্য, এটা কখনওই মেনে নেওয়া যায় না। তা ছাড়া কাউন্টি ক্রিকেটে খেলোয়াড়রা যখন যথেচ্ছ লোগো ব্যবহার করছে, তখন টেস্ট খেলায় কেন তা পারবে না? এই সহজ যুক্তিও বোর্ডের কর্তাদের নিরেট কিন্তু প্যাঁচালো মাথায় ঢোকানো শক্ত। এতে প্রশাসকরা তো ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন না। তা হলে খেলোয়াড়দের উপর এই অবিচার চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন?"

চার বছর আগে একবার টেস্ট দল থেকে বাদ পড়ার প্রসঙ্গটি তুলে ভার্দে তার বইয়ে এক জায়গায় লিখেছে: "আমাদের জাতীয় দল গড়ার জন্য যে লোকগুলি টেবিলে বসে বিজ্ঞ কথাবার্তা বলে, তারা এক একটা ভাঁড় ছাড়া আর কিছু নয়। ওদের সার্কাসে গিয়ে লোক-হাসানোর কাজ নেওয়া উচিত।"

আর এক জায়গায় সে মন্তব্য করেছে: "দলের অনেক সিনিয়র খেলোয়াড়ই ম্যাচ নিয়ে চিন্তা করার চেয়েও বেশি চিন্তা করে নিজেদের স্বার্থ নিয়ে। কাপুর এবং পিল্লাই কদাচিৎ টিম মিটিংয়ে আসত। মাঠেও এরা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে আগ্রহী ছিল না। গতবার ইংল্যান্ড সফরে হেডিংলি টেস্টের পঞ্চম দিনে হাতে ছয় উইকেট নিয়ে যখন জিততে ৫৭ রান বাকি, পিল্লাই ও কাপুর যখন বোলিংয়ের মাথায় চড়ে বসেছে, তখনই দু'জন বিস্ময়কর দুটি বাজে স্ট্রোক নিয়ে আউট হয়ে ফিরে আসে। আমরা ১৬ রানে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচটি হারি। আমার স্থির বিশ্বাস, ওরা দু'জন যদি অমনভাবে আত্মহত্যা না করত, তা হলে পরের ব্যাটসম্যানরা ঘাবড়ে যেত না। ছয় উইকেটেই ভারত জিতত।"

ইংল্যান্ডে ভার্দে ওই সিরিজেই স্টিফেন রাইফের সঙ্গে মাঠে

তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েছিল ওভালে, চতুর্থ টেস্ট ম্যাচের চতুর্থ দিনে। ইংল্যান্ডের রবার্টসনের ব্যাট-প্যাড ক্যাচের আবেদন রাইফ নাকচ করে দিলে, ভার্দে সিলি মিড অন থেকে বোলার ধারাদ্ধারকে লক্ষ করে বলে, 'বাহ্, চমৎকার আম্পায়ারিংই বটে। ভারতীয় ব্যাটসম্যান হলে আঙুলটা ঠিকই উঠে যেত।' ধারাদ্ধার তখন বলে, 'বোল্ড না করলে··· দের আউট করা যাবে না।' দু'জনের কথা রাইফের কানে গিয়েছিল। তিনিও 'ব্লাডি চিটারস্, ইউ ··· ইন্ডিয়ানস' বলে গালাগাল দেন। ভার্দে লিখেছে, "তারপর, আর মেজাজ ঠিক রাখা সম্ভব হল না। ভারতীয়দের 'চিট' বলাটা আমার কাছে কল্পনাতীত অভিযোগ, স্বপ্নেরও অগোচরে। আমিও পালটা কিছু কথা তাকে বলি। এরপরই ঝড় উঠল। পরদিন সকালে রাইফ জানালেন, "আমি লিখিতভাবে ক্ষমা না চাইলে তিনি মাঠেই নামবেন না। আমিও বললাম, "ক্ষমা চাইতে রাজি, যদি রাইফও ক্ষমা চেয়ে চিঠি দেন।" কিন্তু টি সি সি বি তাদের আম্পায়ারের পক্ষই নিল। পঞ্চম দিনের খেলা বন্ধ রইল। ইতোমধ্যে ভারতীয় দলের ম্যানেজার ফোনে যোগাযোগ করলেন ভারতীয় বোর্ড প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। দিল্লির সাউথ ব্লকও খোঁজখবর শুরু করল লন্ডনে আমাদের হাই কমিশনারের কাছে। হাই কমিশনার ডেকে পাঠালেন আমাদের ম্যানেজারকে। আমি প্রমাদ গুনলাম। ম্যানেজার ফিরে এলেন মুখ লাল করে। বললেন, "যে কোনও মূল্যেই হোক, খেলা চালু করতে হবে। দিল্লির বিদেশ দপ্তর থেকে কড়া নির্দেশ এসেছে।" শেষ পর্যন্ত মূল্যটা দিতে হল ভারত-অধিনায়ককেই নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে। পরদিন সকালে রাইফের হাতে চিঠিটা দিলাম খেলা শুরুর চল্লিশ মিনিট আগে। জবরদস্তি আমাকে দিয়ে এটা করানো হল। ঘটনাটা আমাকে চুরমার করে দেয়। আমি মনে-প্রাণে বোর্ডের সমর্থন চেয়েছিলাম, কিন্তু পাইনি। ভেবেছিলাম মাঠে নামব না, পদত্যাগই করব। কিন্তু এটাও জানি, আমি মাঠে না নামলে দলের একজনও মাঠে নামবে না। সবাই জিদ ধরে সেদিন আমার পিছনে দাঁড়ায়। তারা সবাই একযোগে বিবৃতিও দেয় আমাকে সমর্থন করে। তবু আমি পদত্যাগ না করে মাঠে নামি। না নামলে রাইফেরই নৈতিক জয় হত। খেলাটা শুরু হল এবং বিরক্তিকর ড্র হল। ভেবেছিলাম আমাদের বোর্ড নিশ্চয় কিছু

ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু নেয়নি। আমাকে অপমান হজম করতে হল।"

আনন্দবাজারের স্টাফ রিপোর্টার ভার্দের বই থেকে উদ্ধৃতিগুলো দিয়ে মন্তব্য করেছেন, "ভারতীয় ক্রিকেটারদের এই বিবৃতি নজীরবিহীন ঘটনা তো বটেই, সেইসঙ্গে চুক্তিবিরোধীও। ভারতীয় বোর্ডের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী এটা তাঁরা করতে পারেন না। আর অপমান হজম করার কথা ভার্দে লিখেছেন বটে, কিন্তু হজমটা কোন্ হজমিবড়ি দিয়ে করানো হল, সেটা আর লেখেননি। ওই ঘটনার দু'দিন পরই বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও কোষাধ্যক্ষ লন্ডনে উড়ে গিয়ে ভারতীয় দলের সঙ্গে বসে কথা বলেন। ঝিমিয়ে-পড়া দলের মনোবল ফেরাতে তাঁরা দলের প্রত্যেককে বাড়তি পাঁচ হাজার টাকা দেবার কথা বলেন, ভার্দেকে পনেরো হাজার টাকা। কয়েকজন খেলোয়াড় টাকা নিতে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, 'এটা তো ঘুষেরই সামিল। আমরা টাকা নয়, সম্মান পুনরুদ্ধার চাই।' কিন্তু বেশিরভাগের ইচ্ছার কাছে তাঁদের নতি স্বীকার করতে হয়। ভার্দেও পনেরো হাজার টাকা হজম করেন।

"ভার্দের বইটি এখানে বোমার মতোই ফেটেছে। চারদিকে কানাঘুষো, কিন্তু কেউ কোনও কথা বলতে চাইছেন না। সবার মুখেই চাবি-আঁটা। যাকেই জিজ্ঞাসা করি, বলছেন এখনও পড়ে ওঠা হয়নি। মুখ দেখে অবশ্য বুঝতে অসুবিধা হয় না, ঠিকই পড়েছেন। হয়তো দু' তিনবারও।

"আভাস পেলাম বোর্ডের তিন-চারজন বড়কর্তা আজ বা কালই শলা-পরামর্শ করতে বসবেন। ভার্দেকে ওরা ম্যাচ শেষ হলেই শো-কজ চিঠি ধরাবেন খবরের কাগজে কলাম লেখার জন্য। সেইসঙ্গে নতুন চুক্তিপত্র আবার খেলোয়াড়দের দিয়ে বলা হবে সই করতে। যেসব শর্ত ওরা কেটে দিয়ে সই করেছিল, সেগুলি এই নতুন চুক্তিপত্রে আবার রাখা হবে। যদি সই করতে ওরা রাজি না হয়, বোর্ড তা হলে এবার চরম ব্যবস্থা নিতে পেছুপা হবে না। মনে হচ্ছে এবার একটা শো-ডাউন হবেই।"

তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার রান দাঁড়াল, দু'জন ওপেনারকে হারিয়ে ৮০। চতুর্থ দিন সকালে ষষ্ঠ ওভারে নাইটওয়াচম্যান গোল্ডি তার ৪০ মিনিটের ইনিংস শেষ করল মাত্র এক রান করে। অস্টেরলিয়ার তখন ৯১ রান। তিনটি উইকেটই পেয়েছে ফরজন্দ। কিন্তু

টেস্টম্যাচে এগারোটি শূন্য পাওয়া গোল্ডি ৩৮ বল খেলে গেল। উইকেট থেকে ফরজন্দের বল যেভাবে ব্যাটসম্যানদের কাছে আসছে, তাতে অস্ট্রেলিয়ার ধসে পড়ার আশঙ্কা নেই!

বোলান নামল এবং দুই ওভারের মধ্যেই তার ইচ্ছাটা সে জানিয়ে দিল। সেটা হল, লাঞ্চের পর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সে দল নিয়ে হোটেলে রওনা হতে চায়। মিন্টার ৩১ রান করে কাপুরের বলে কভারে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যেতে ব্রাইট নামল। বোলানের তখন ১৪ ; অস্ট্রেলিয়া ১১১-৪। কুড়ি ওভার পর লাঞ্চ। বোলান ৫২, ব্রাইট ৪৪। অস্ট্রেলিয়া তখন জয় থেকে ৭৯ রান দূরে। লাঞ্চের পর চতুর্থ ওভারে ফরজন্দ তার চতুর্থ শিকার পেল ব্রাইটকে। অস্ট্রেলিয়া পাঁচ উইকেটে ২০৩। এরপর উডফোর্ডকে নিয়ে একঘণ্টা পর বোলান ড্রেসিংরুমে ফিরে এল, সঙ্গে অপরাজিত ১০৮ রান। উডফোর্ডও অপরাজিত ১৩। ফরজন্দ এবং পুষ্করনার বোলিংকে স্কুল ম্যাচের স্তরে নামিয়ে দিয়ে ষোলোটি বাউন্ডারি মেরে তিন ঘণ্টায় বোলান তার সেঞ্চুরিটি তুলে নিয়ে যখন দু'হাত আকাশের দিকে তুলে ঝাঁকাল, জীবন তখন বোধহয় বোলানের থেকেও খুশিভরে মন্থরগতিতে কলম চালিয়ে লিখল : "ম্যাচটা বেরিয়ে গেল। তুই বোধহয় খেলছিস।"

অস্ট্রেলিয়া পাঁচ উইকেটেই জিতল, দেড়দিন হাতে রেখে।

সন্ধ্যার সময় অনন্তর টেলিফোন এল। জীবন রিসিভার তুলে, গলা শুনেই বলল, "প্লেনের টিকিটটা এনেছিস?"

"হ্যাঁ। ফ্লাইট কাল দুপুরে।"

"আমি তোকে বাড়ি থেকে তুলে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে আসব। আজকের কাগজ পড়েছিস?"

"ভার্দের বই সম্পর্কে লেখাটা?"

"হ্যাঁ"। একটু সময় দিয়ে জীবন বলল, "ভারতের ক্রিকেটে যা ঘটেনি, এবার তাই ঘটবে।"

"কী ঘটবে?"

"সেদিন যা বলেছিলাম। সময় ঘনিয়ে এসেছে। ভার্দেকে যদি শো-কজ করে, আর ওকে সামনে রেখে টিম যদি বিদ্রোহ করে, তা হলে

বোর্ড চ্যালেঞ্জটা নেবে।"

"বোর্ডের এত সাহস হবে কি ?"

"হবে। আজকের রেজাল্টই সাহসটা দেবে। তবে আমার মনে হয়, বোম্বাই আর বাঙ্গালোর টেস্ট পর্যন্ত টানাটানিটা চলবে। কেন চলবে জানিস ? এই অস্ট্রেলিয়া টিমের কাছে আরও দুটো টেস্ট ইন্ডিয়া হারবে। হ্যাঁ, হারবে। টিভির একটা সুবিধে কি জানিস, ক্লোজ আপে মুখের ভাব খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ করে দেয়। তুই আমাদের প্লেয়ারদের মুখগুলো লক্ষ করেছিস কি ?"

"করেছি। মনে হচ্ছিল কেউ খেলতে চায় না।"

"তার কারণ গোটা টিমটাই ডিস্টার্বড। স্পিরিট বলে কোনও জিনিসই নেই। মনে হচ্ছিল সব ভাড়াটে সৈনিক। এরা কোনও টেস্টই এই সিরিজে জিততে পারবে না। এদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হওয়ারই শুধু অপেক্ষা। নারায়ণ সরকারকে ফোন করেছিলাম। হরিহরণ ওকে বলেছে, হায়দরাবাদের ম্যাচটা বোর্ডের কাছে খুব ক্রুসিয়াল। তার মানে, বোর্ড প্লেয়ার দেখে নিতে চাইছে রিপ্লেস করার জন্য। তোকে যখন ডেকেছে, আর আমার কোনও সন্দেহ নেই। অন্তু, তুই আর যাকেই নিরাশ করিস, তোর বাবাকে করিস না। উনি প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন তোকে ক্রিকেটার করে তোলার জন্য। ওঁকে শান্তি দিস।"

জীবন তার দীর্ঘ সংলাপ থামাল। ওধার থেকে কোনও সাড়া নেই। জীবন বারতিনেক "হ্যালো অন্তু ?" বলার পর ঘুম ভেঙে ওঠার মতো "উঁউ" শব্দ হল।

"কাল পৌনে তিনটেয় তোর ফ্লাইট। আমি একটা থেকে সওয়া একটার মধ্যে পৌঁছচ্ছি।"

অনন্ত ও জীবন দমদম এয়ারপোর্টে পৌছল দুটোয়। পথে অনন্ত বলে, "এই প্লেনে চড়ে যাওয়াটা খুব বাজে ব্যাপার।"

"কেন ? কত সময় বাঁচে জানিস ? ট্রেনের চব্বিশ ঘণ্টার পথ দু' ঘণ্টায় চলে যায় !"

"তা জানি। কিন্তু আমার কেমন যেন ভয় করে।"

"ভয় ?" জীবন এমন কথা অন্তুর মুখে প্রথম শুনছে।

"বুকের মধ্যে কীরকম হয়, কে যেন খামচে ধরে কলজেটা। সিরসির করে সারা শরীর। খালি মনে হয় প্লেনটা যদি পড়ে যায়?"

"ওহ্‌হ্‌ অন্তু, পুরুষ মানুষের এসব ভয় থাকতে নেই। তুই একাই কি প্লেনে যাচ্ছিস? আরও একশো মানুষ তোর সঙ্গে রয়েছে, বুড়ো-বাচ্চা..." জীবন বাঁ হাত দিয়ে অন্তুর উরুতে চাপড় মারল।

অন্তু সন্তর্পণে আড়চোখে জীবনের বাঁ হাতের দিকে তাকাল। চামড়ার নীচে মোটা তিন-চারটে শিরা। তার মধ্য দিয়ে রক্ত বইছে। ঈষৎ গোলাপি নখ। চমৎকার লম্বা আঙুল। চওড়া কবজি। আর অন্য হাত, যেটা স্টিয়ারিংয়ে, সেখানেও আঙুল, কবজি রয়েছে, কিন্তু...। তার বুকের মধ্যে কলজেটা কে যেন খামচে ধরল। 'আমার জন্য, আমার জন্য' মনে মনে সে বলল।

অনন্ত লাইন দিয়ে বোর্ডিং পাস এবং সুটকেস জমা দেওয়ার কুপনটা সংগ্রহ করার কিছুক্ষণ পরই লাউডস্পিকারে ঘোষণা হল, হায়দরাবাদের যাত্রীরা সিকিউরিটি চেকের জন্য এগোন। পুরুষ ও মেয়েদের জন্য মাত্র একটি করে দরজা। সেখানেও লাইন পড়ে গেছে।

"ওই দ্যাখ অন্তু, তোর থেকে অনেক ছোট।"

লাইনে দাঁড়িয়ে চার-পাঁচ বছরের একটি শিশু। জীবনের দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে অনন্ত তাকাল। পিছনে লাগার একটা অজুহাত জীবন পেয়ে গেছে।

"ভয় কী জিনিস সেটা বোঝার মতো বয়স ওর হয়নি," অনন্ত বলল।

"তোর বুঝি হয়েছে?"

অনন্ত মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল জবাব না দিয়ে। মানুষের সারিটা ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। জীবন ওর সঙ্গে-সঙ্গে সিকিউরিটি চেকিংয়ের দরজা পর্যন্ত এল। অনন্ত যখন দরজা দিয়ে ঢুকতে যাবে জীবন তখন বলল, "অন্তু একটা কথা বলব।"

"বল।"

"একটু নিচু হ, তুই বড্ড লম্বা।"

ছ্যাঁত করে উঠল অনন্তর বুকের মধ্যে। কে যেন তার কলজেটা খামচে ধরল। মোটরের হেড লাইটের আলো... রাস্তার মাঝে ওলটানো

আরশোলার মতো স্কুটারটা পড়ে রয়েছে··· জীবন বাঁ হাতে ভর দিয়ে নিজেকে ওঠাবার চেষ্টা করছে। ···'অন্তু, তুই বড্ড লম্বা, নিচু হ।' অনন্ত ঝুঁকল। তারপর সেই কথাটা 'আমার আর টেস্ট খেলা হবে না রে।' তখন কী কথাটা যেন সে জীবনকে বলেছিল ?

"না, নিচু হব না, তুই বল।"

জীবন প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলল, "আমার মন বলছে তুই টেস্ট খেলবি।"

"চলুন, চলুন, লাইনটা দাঁড়িয়ে গেছে।"

পিছন থেকে অধৈর্য কণ্ঠে একজন এইসময় বলে উঠল। অনন্ত দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। আর একবারও সে পিছন ফিরে তাকাল না। তাকালে দেখতে পেত জীবন তার ডানহাতটা পিছনে লুকিয়ে বাঁ হাত নাড়িয়ে তাকে বিদায় জানাচ্ছে।

॥ ছয় ॥

পঁচিশ বছরের কম বয়সীরা প্রায় হেরে যাচ্ছিল, যদি না ফলো-অনের পর উসমানি অসাধারণ দৃঢ়তা দেখাত। প্রথম টেস্টের পরই অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলের সিনিয়র চারজন আগ্রায় তাজমহল দেখে ফিরে, তিনদিন দিল্লিতে কাটিয়ে দ্বিতীয় টেস্টম্যাচ খেলার জন্য কানপুর চলে যায়। হায়দরাবাদের ম্যাচটিকে তারা গুরুত্ব দেয়নি।

হোটেলে চেক-ইন করে অনন্ত রিসেপসনিস্টের কাছে খোঁজ নেয়, কে তার রুম মেট ? দেশরাজ আনোখার নাম শুনে সে স্বস্তি বোধ করে। ঘরের চাবি বোর্ডে ঝোলানো নেই, তার মানে ঘরের লোকের কাছে রয়েছে, অর্থাৎ আনোখা ঘরেই আছে।

"আরে ইয়ার, তুম আ গয়ে।"

অনন্তকে ঘরে ঢুকতে দেখেই লাফিয়ে উঠল আনোখা। "অনেকদিন পর দেখা হল, প্রায় একবছর, তাই না ?"

"দশমাস।

জানুয়ারিতে চণ্ডীগড়ে পঞ্জাবের সঙ্গে রঞ্জি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় দু'জনের শেষবার দেখা হয়েছিল। ম্যাচে সাতটা উইকেট অনন্ত পায়।

কিন্তু প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকায় পঞ্জাব জেতে। আনোখা পেয়েছিল এগারো উইকেট।

"চা খাবে ?"

"হ্যাঁ।" অনন্ত ঘরের কোণে কাঠের টেবলে তার সুটকেসটা রেখে জিজ্ঞাসা করল, "কাল সকালেই প্র্যাকটিস ?"

"দশটায়।"

আড়াইঘণ্টা প্র্যাকটিস শেষে অধিনায়ক উসমানি জানিয়ে দেয়, আবার চারটের সময় দ্বিতীয় দফা প্র্যাকটিস হবে। এখানে এসে অনন্তর সঙ্গে উসমানির প্রথম দেখা রাতে খাবার টেবলে। শুধু একবার তাকিয়ে "হ্যালো" বলা ছাড়া উসমানি আর কোনও কথা বলেনি। সকালে লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্টেডিয়ামে পি· টি· করার পর যখন নেটে ব্যাটিং প্র্যাকটিস শুরু হল নতুন বল দিয়ে, হঠাৎ উসমানি তখন অনন্তকে বলে, "তুমি পরে বল কোরো, আগে রেগুলার বোলাররা নতুন বলে বল করুক।"

অনন্ত শুনে আশ্চর্য হয়। সে বলেছিল, "আমি কি ইরেগুলার নাকি ?"

"এগারোজনের টিমে যারা থাকতে পারে তারাই নতুন বল প্রথম ব্যবহার করুক। আমি এটা চাই।"

"যদি একজন বাড়তি লোক বল করেই তাতে ক্ষতিটা কী ?"

"অস্ট্রেলিয়ান নিউ বল অ্যাটাক যে ধরনের, আমি সেই ধরনের বলে প্র্যাকটিস করাতে চাই। তোমার বল একটু অন্য রকমের, তুমি একটু পরে বল করতে এসো।"

অনন্তর কাছে যুক্তিটা অদ্ভুত মনে হল। চেয়ারম্যান সমেত চারজন জাতীয় নির্বাচক মাঠে রয়েছেন, যা সাধারণত দেখা যায় না। শোনা গেল, বোর্ড প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারিও আসবেন। যেন টেস্ট ম্যাচ খেলা হবে এমন একটা ভাব চারদিকে ছড়ানো।

নেটে প্রথম ব্যাট করতে গেল উসমানি। নতুন বল নিয়ে শুরু করল চারজন বোলার। অনন্ত নেটের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাগে তখন তার শরীর জ্বলে যাচ্ছে। একজন নির্বাচক, মধ্যাঞ্চলের মৃদুল শর্মা তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কি তুমি বল করছ না যে ?" অনন্ত তাকে

উসমানির কথাগুলো জানাল। শুনে তিনি মাথা নেড়ে তারিফ করে বললেন, "হি ইজ এ ব্রেইনি চ্যাপ ! কতটা ভাবনা চিন্তা করে দেখেছ ? অস্টেরলিয়ান অ্যাটাক কীভাবে অবজার্ভ করেছে, অ্যাঁ ! আমি বলে দিচ্ছি ও একদিন ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন হবে, হবেই।"

উসমানি নেট থেকে বেরিয়ে যখন চেয়ারের দিকে যাচ্ছে, তখন অনন্তর সঙ্গে চোখাচোখি হল। অনন্ত দাঁত চেপে বলল, "এইবার কি বল করতে পারি ?"

"তোমার ইচ্ছে।" উসমানি নিস্পৃহ স্বরে বলল।

অনন্ত টানা আধঘণ্টা বল করল। তার অফ কাটারগুলো গুড লেংথ থেকে লাফিয়ে উঠছিল। একজনের বুকে, আর একজনের হেলমেটে লাগার পর, দলের ম্যানেজার অনিল পটবর্ধন তাকে ডেকে বললেন, "সেন, ওরা ম্যাচ খেলবে, ইনজুরি হলে টিমেরই ক্ষতি। তুমি সোজা ওভারপিচ বল করো অফ স্টাম্পের বাইরে, ওদের শট নিতে দাও।"

হাতের বলটা আলতো করে মাটিতে ফেলে দিয়ে অনন্ত সরে গেল।

"কী হল, তুমি বল করবে না ?" আনোখা ওকে জিজ্ঞেস করল।

অনন্ত মাথা নাড়ল। তার মনে পড়ল বাবার একটা কথা : ক্রিকেট খেলাটা হল টাইট রোপ ওয়াকিং, পড়ে গেলে অবধারিত মৃত্যু। এখন তাকে দড়ির উপর দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে।

"কাঁধে একটা খচখচ ব্যথা লাগছে। বরং ক্যাচ প্র্যাকটিস করি।"

আনোখা মুচকি হেসে বলল, "এখানে মিছিমিছিই তোমাকে ডেকে এনেছে।"

"তাই মনে হচ্ছে।"

"মনে হচ্ছে নয়, যা বলছি শুনে নাও। টিম হয়েই আছে, তুমি তাতে নেই। আমার জোনের সিলেক্টর আজ সকালেই আমাকে বলে দিয়েছে।"

আনোখার কথা মিলে গেল। অনন্ত দ্বাদশব্যক্তি পর্যন্তও নয়, তিনজন অতিরিক্তের অন্যতম মাত্র। বোলানের অনুপস্থিতিতে মিন্টার। টস জিতে ব্যাট নেয়। প্রথম ছয় ওভারেই আনোখা তিনটি উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তারপর দিনের শেষে তারা ৩৭০

রানে পৌঁছয় আর একটিও উইকেট না হারিয়ে। পরদিন সকালেই বিল টুমি আর চার্লস কনরাড নিজেদের ডাব্‌ল সেঞ্চুরি পূর্ণ করে নেয়। তিন উইকেটে ৪৬০ রানে ইনিংস ছেড়ে দিয়ে লাঞ্চের আগে অস্ট্রেলিয়া একটা উইকেট পেয়ে যায় এবং সেটি উসমানির। সামিয়ানার তলায় চেয়ারে বসেছিল অনন্ত। তার পাশ দিয়েই উসমানি ফিরে আসার সময় পলকের জন্য দু'জনের চোখাচোখি হল। একই সঙ্গে দু'জনে চোখ সরিয়ে নিল। উসমানি ইয়র্ক্‌ড হয়েছে একটিও রান না করে।

তিন ঘণ্টায় ১১৪ রানে পঁচিশের কম বয়সীরা প্রথম ইনিংস শেষ করে। চায়নাম্যান বোলার লেসলি ছ'টা আর অফ-স্পিনার ম্যাড্রফ চারটে উইকেট নিয়েছে। ওরা এখনও একটাও টেস্ট খেলেনি। অনন্ত অবাক হল, ব্যাটিং প্র্যাকটিস নেবার বদলে মিন্টারের ফলো অন করাবার সিদ্ধান্ত নেওয়ায়। একটা টেস্টম্যাচের আগে সাধারণত এই সুযোগটা সবাই নেয়। কিন্তু পরদিন সকালে সে খবরের কাগজে মিন্টারের ইন্টারভিউ থেকে জানল তাঁর দুজন সম্ভাবনাময় তরুণ স্পিনার যাতে তাড়াতাড়ি টেস্টদলে আসতে পারে, তাই ওদের আরও বেশি অভিজ্ঞতা ও সাফল্য পাইয়ে উৎসাহিত করার জন্য ব্যাট করেননি। এই সিরিজেই ওদের তিনি টেস্ট খেলাতে চান। কাগজটা আনোখাকে দিয়ে সে বলল, "এটা পড়ো।"

আনোখা পড়ে বলল, "আর তোমাকে এরা কী ভাবে ট্রিট করল ? সেন, তুমি হেট করো। শুধু ব্যাটসম্যানদেরই নয় এদেরও হেট করো। তা হলে তুমি টগবগ করে ফুটবে। বদলা নেবার জন্য অপেক্ষা করো, তারপর সুযোগ এলে এদের ছিঁড়ে ফালিফালি করে দাও।"

"হ্যাঁ, এবার থেকে ঘৃণাই করব।"

অনন্ত কথাটা বলল বটে, কিন্তু মনের অন্তস্থলে তেমন সাড়া পেল না। সে শিশু বয়স থেকে ঘৃণা করতে অভ্যস্ত নয়। বাবা তাকে এই জিনিসটি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে শুধু ভালবাসতে শিখিয়ে গেছেন। বলতেন, ট্যালেন্ট, পরিশ্রম আর সাফল্যের জন্য ক্ষুধা, এই তিনটেই বড় হবার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অনন্তর মনে হল, বাবাই ঠিক। শুধু ঘৃণা দিয়ে কিছুক্ষণ সাফল্য পাওয়া যায়, পাঁচ ওভার, কি দশ ওভার ! কিন্তু একজনের গোটা কেরিয়ার ঘৃণার উপর নির্ভর করে চলতে পারে না।

সে ঠিক করল কলকাতায় ফিরে আরও বেশি খাটবে।

তৃতীয় দিন বিনা উইকেটে সাত রান নিয়ে উসমানি আর শাম্মি সারিন শুরু করল। লাঞ্চের আগের ওভারে সারিন ম্যাড্রফের বলে স্টাম্পড্ হল ৩৮ রান করে। উসমানির তখন আঠারো। এক উইকেটে ৬৪ রান। চায়ের সময় পঁচিশের কম বয়সীদের চার উইকেটে ১২০। চায়ের পর তিন ওভারেই লেস্‌লি সাত বলের ব্যবধানে চারটি উইকেট পায়। উসমানির তখন ৬৮ রান। হাতে দু'টি উইকেট, খেলতে বাকি অন্তত ২৫ ওভার। লেগ স্পিনার জ্যোতি পটেলকে নিয়ে সে তখন ধৈর্যের লড়াই শুরু করল। এগারো নম্বরে ব্যাট করবে আনোখা। অনন্ত তাকে প্রেয়ার্‌স এনক্লোজারে প্যাড পরে চেয়ারে বসে থাকতে না দেখে অবাক হল। এখনই তো পটেল আউট হয়ে ফিরবে আর আনোখাকে নামতে হবে, অথচ ও তৈরি নেই!

অনন্ত উঠে ড্রেসিং রুমে গিয়ে দেখল, লম্বা মাসাজ টেবলে প্যাড পরে তৈরি হওয়া আনোখা চিত হয়ে শুয়ে। বুকে জড়ো করা দুই মুঠি। চোখ বন্ধ।

"দেশি!" অনন্ত ডাকল।

আনোখা চোখ খুলল, "আউট হয়েছে?"

"না। কিন্তু তুমি এখানে, এভাবে শুয়ে কেন?"

"মাঠের দিকে আর তাকাতে পারছিলাম না। এত টেনশন, তাই পালিয়ে এসেছি।"

"হেট করো, নিজেকে তাতিয়ে তোলো।"

"সেন আমি ব্যাটসম্যানদের হেট করি কিন্তু বোলারদের করি না।"

কথাটা শুনে আর আনোখার করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে অনন্তর হাসি পেল। কিন্তু এখন সেটা খুব বেমানান হবে ভেবে মুখ গম্ভীর করে বলল, "এখন থেকে তা হলে বোলারদেরও হেট করতে শুরু করো। একা-একা থেকো না, টেনশন তাতে আরও বাড়বে। বাইরে এসো।"

বাইরে তখন হাজারকুড়ি লোক দমবন্ধ করে দেখছে, পটেলকে আড়াল করে উসমানি লেগস্পিন, গুগলি আর অফ-স্পিনের সঙ্গে অসাধারণ ফুট-ওয়ার্ক, বিচারবোধ আর টেকনিক সম্বল করে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আম্পায়াররা যখন বেল তুলে নিলেন, পটেল তখন দুই রানে আর

উসমানির ৯১। ম্যাচ বাঁচিয়ে দু'জন ফিরে এল।

অনন্ত এগিয়ে গেল। উসমানি ব্যাট তুলে অভিনন্দন নিতে-নিতে এগিয়ে আসছে। চোখাচোখি হল।

"তুমি বড় খেলোয়াড়।" অনন্ত বলল।

"ধন্যবাদ, তবে এখনও ইয়র্কার সামলাতে পারি না।" উসমানি বলল মুখে উচ্ছ্বাস না ফুটিয়ে।

কলকাতায় পরদিন সে ফিরল সন্ধ্যার ফ্লাইটে। এয়ারপোর্টে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল জীবন। গাড়ি যশোর রোডে পড়ে নাগের বাজারের দিকে এগোতেই জীবন বলল, "তোকে খেলাল না কেন?"

"বলতে পারব না। এই নিয়ে আমি কাউকে জিজ্ঞাসাও করিনি, করে কী লাভ?"

"লাভ-লোকসানের কথা নয়, তবু কারণটা জেনে রাখা ভাল।"

"ইস্ট জোনের সিলেক্টার ওখানে ছিল না। আমার হয়ে কে তা হলে সিলেকশন মিটিংয়ে বলবে? যেসব সিলেকটরেরা ছিল, তারা তো নিজের-নিজের জোনের ছেলেদের টিমে ঢোকাতেই ব্যস্ত। আমার হয়ে কে আর বলবে।"

"হরিহরণ কি ওখানে ছিল?"

"আসবে শুনেছিলাম, কিন্তু আসেনি। উনিই তো আমাকে নিয়ে গেলেন জরুরি ফোন করে।"

"গ্রুপবাজি। সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান হরিহরণের বিরোধী গ্রুপের, নর্থ আর সেন্ট্রাল জোনও তাই। যদি একটা কিছু ওলটপালট হয়, আর তুই যদি টেস্ট টিমে আসতে চাস, তা হলে ইস্ট জোনের সঙ্গে খেলাটায় তোকে দেখাতে হবে।"

"কী দেখাতে হবে!"

"তোকে আর ইগনোর করা সম্ভব নয়।"

অনন্ত চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পর জীবন জানতে চাইল, "লেসলি আর ম্যাড্রফ কেমন বোলার?"

"ভালই। রঞ্জি ট্রফিতে অনেক উইকেট পাবে। কিন্তু এখনও টেস্ট

ক্লাস নয়।"

"সে কী! তা হলে এতগুলো উইকেট নিল কী করে?"

"আমাদের ব্যাটসম্যানরাও কি টেস্ট ক্লাসের? একমাত্র উসমানি ছাড়া? ফার্স্ট ইনিংসে ইয়র্কড হয়েছে পেসে। অ্যামরোজের ইনসুইং বলটা ডিপ করল হঠাৎ। কিন্তু সেকেন্ড ইনিংসে কী খেলাটাই না খেলল। স্পিনার দুটো তো বল ফেলার জায়গাই খুঁজে পাচ্ছিল না। এখনও খুব কাঁচা। ভার্দে কি পিল্লাই কি ভোজানির পাল্লায় পড়লে বলের সুতো খুলে দেবে। অথচ কী যে একটা আতঙ্ক আমাদের ব্যাটসম্যানদের মনে ঢুকে গেল আর কাঁপতে-কাঁপতে সবাই লেসলি আর ম্যাড্রফকে উইকেটগুলো দিয়ে দিল। দুটো বিদেশী স্পিনার এসে ভারতের মাটি কাঁপিয়ে দিল, এমন ব্যাপার গত দশ বছরে ঘটেছে বলে শুনেছিস?"

"দুজনকে এই সিরিজেই খেলাবে বোধহয়।"

"মনে হয় না। বোলান অত কাঁচা লোক নয়। এই ধরনের ম্যাচে এক ঝুড়ি উইকেট পেলেই যে টেস্ট খেলার যোগ্য হয়ে গেছে...." অনন্ত কথাটা শেষ না করে চেঁচিয়ে উঠল, "এই এই এই!"

গাড়ির সামনে এসে পড়েছে এক বৃদ্ধা। ব্রেক কষে জীবন গাড়িটা থামিয়েছে তার এক সেন্টিমিটার আগে। ঘাবড়ে দিশেহারা হয়ে যাওয়া বৃদ্ধা দ্রুত রাস্তাটা পার হল অপর দিক থেকে আসা একটা ট্যাক্সিকে ব্রেক কষিয়ে।

জীবন হেসে উঠল। অনন্ত ভ্রূ কুঁচকে তাকাল ওর মুখের দিকে।

"হাসলি কেন?"

"জীবনটা কী অদ্ভুত! বুড়ির ছিটকে-যাওয়ারই কথা, কিন্তু তার বদলে কেমন দৌড়ে গেল। যার যেমন হওয়ার কথা সে তেমন হল না।"

অনন্তর কেন জানি মনে হল, জীবন যেন নিজের সম্পর্কেই কথাটা বলল। ওর প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা ছিল টেস্ট ম্যাচ খেলার। কিন্তু সেটা আর কোনওদিনই সম্ভব হবে না। না হওয়ার জন্য দায়ী, একমাত্র দায়ী তো অনন্তই। সে এটা চিরকাল মনে রাখবে আর জীবনও তা নিশ্চয় কোনদিন ভুলতে পারবে না। কথাটা ভাবতে ভাবতে অনন্ত গুম হয়ে গেল।

নাগের বাজার মোড় থেকে গাড়িটা ডান দিকে দমদম রোডে বাঁক

নেবার পর জীবন বলল, "কী ভাবছিস ? এত মনমরা দেখাচ্ছে কেন ?"

"তুই আমাকে বোধহয় কোনওদিনই ক্ষমতা করতে পারবি না।" আচমকাই অনন্তর মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে এল।

"কী বললি ?"

"আমি জানি তুই যা হতে চেয়েছিলি আমার জন্যই তা হল না।"

কর্কশ ব্রেকের শব্দ আর ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি থেমে যেতেই অনন্ত সভয়ে সামনের প্রায়-অন্ধকার রাস্তায় তাকাল। আবার কেউ কি চাপা যাচ্ছিল না কি ! কিছু দেখতে না পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে জীবনের দিকে তাকাতেই দেখল সে ডান হাতটা তুলে রয়েছে।

"আবার বল।" ঠাণ্ডা ইস্পাতের মতো কঠিন আর শান্ত স্বর জীবনের গলায়। "আর একবার বল, তা হলেই দেখবি এই হাতটার কেরামতি। একটা ঘা যদি তোর মাথায় দি, তা হলে খুলি ফেটে যাবে।"

কথাটা বলে জীবন গাড়ির ইগনিশান চাবি ঘোরাল। পথে কেউ আর একটি কথাও বলেনি।

রাতে খাওয়ার সময় অনন্ত তার মাকে বলল, "জীবন আমার ওপর রাগ করেছে। হঠাৎই আমি পথে আসার সময় একটা কথা বলে ফেলেছি।" দু'জনের মধ্যে যেসব কথা হয়েছে মাকে জানিয়ে সে বলল, "আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না মা, ভুলতে পারবও না। আমার মনে হয় জীবনের পক্ষেও তা ভোলা সম্ভব নয়।"

"হ্যাঁ, সম্ভব নয়।" তনিমা একটু বিচলিত হয়ে বললেন। "কিন্তু জীবন খুব বিচক্ষণ ছেলে, হৃদয়বান। সে এটা বোঝে দুর্ঘটনা যে কোনও সময় যে কোনও মানুষের জীবনে ঘটতে পারে। এটা ইচ্ছাকৃত কেউ ঘটায় না। তবু বিবেকে একটা খচখচানি থেকে যায়। কিছু করার নেই। ও তোকে ভাইয়ের মতো ভালবাসে।"

"জানো মা, সেদিন আমি ওর থ্যাঁতলানো ডান হাতটা দেখে চেঁচিয়ে বলেছিলাম, 'তুই টেস্ট খেলবি, আমি তোকে খেলাব।' কথাটা মনে পড়লেই বড় কষ্ট হয়। মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে গেলে কী ধরনের অবাস্তব কথাই যে বলতে পারে ! অথচ ও আমাকে টেস্ট টিমে দেখার জন্য এতদূর পর্যন্তও কামনা করতে পারে যে, ইন্ডিয়া হেরে যাক !"

"অন্তু তুই যদি অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেতে চাস, তা হলে জীবনের সাধ-ইচ্ছা পূরণ কর ওকে শান্তি দে, ওর বেদনা মুছিয়ে দে।"

"কী ভাবে ?"

তনিমা মুখ ফিরিয়ে দেওয়ালে স্বামীর ছবিটার দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে বললেন, "উনি বলে দিতে পারতেন কী ভাবে।" তারপর কয়েক সেকেণ্ড নীরব থেকে, "জীবনই অনন্তর মধ্য দিয়ে খেলবে টেস্ট ম্যাচ। এটাই হবে তোর প্রায়শ্চিত্ত। তুই যদি জিতিস, তোর মধ্য দিয়ে জীবনও জিতবে। অন্তু, তোর বাবা বলতেন, দেহের থেকেও মন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মনের পূর্ণতা দেহের অপূর্ণতাকে ঢেকে দেয়।"

অনন্ত নির্ণিমেষে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আশ্চর্য, তোমার মধ্যে আমি বাবাকে দেখত পাচ্ছি !"

কানপুরে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে ভারত ইনিংস ও ৪১ রানে হারল। মন্থর উইকেট, বাউন্সও সমান ছিল। অস্ট্রেলিয়া দিল্লি টেস্টের দলটিকেই খেলিয়েছে, শুধু প্রিধামের জায়গায় এসেছে আরউইন। ভারতের ভোজানির জায়গায় খেলেছে বেঙ্কটরঙ্গন।

বোলান টস জিতে দ্বিধা করেনি ব্যাটিং সিদ্ধান্ত নিতে। ম্যাচের প্রথম ওভার থেকেই তারা ভারতীয় বোলিংয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথম দিনে তিন উইকেটে ৩১৮। রজার্স ১২১, বোলান ১০১, আরউইন ৭৯ নট আউট। দুয়ার দুটো, ফরজন্দের একটি উইকেট।

দ্বিতীয় দিন চায়ের সময় অস্ট্রেলিয়া আট উইকেটে ৫৩১ রানে ইনিংস ছেড়ে দেয়। আরউইন ১৮৮ রান আউট। ব্রাইট ৫১ অপরাজিত থাকে। কাপুর একটি, ধারাদ্ধার দুটি ও পুষ্করনা একটি উইকেট আজ পায়। শেষ দেড়-ঘণ্টায় ভারত চার উইকেট হারিয়ে তোলে ৫৬ রান।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের মধ্যে ভারতের প্রথম ইনিংস ১১২ রানে শেষ হয়ে যায়। সর্বোচ্চ রান ভার্দের ৩৫। লটন অ্যামরোজ আর ব্রাইট, এই তিন পেসার উইকেটগুলো ভাগ করে নিয়েছে। ফলো অন করার পর ভারত দিনের শেষে দুই উইকেটে ১৭৬। উসমানি আগের ম্যাচের ফর্মেরই জের টেনে ৮৭ নট আউট, ভার্দেও অপরাজিত ৪২ রানে।

চতুর্থ দিনে তিরিশ বল খেলে উসমানি তার দ্বিতীয় টেস্টেই সেঞ্চুরি পেল লটনকে হুক করে বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে। টিভি ক্লোজআপে দেখা গেল, মুখে একবার তৃপ্তির ছায়া ফুটে উঠেই, এটা খুব বড় ব্যাপার নয় এমন ধরনের নৈর্ব্যক্তিক গাম্ভীর্য ছড়িয়ে পড়ল। ভার্দে এগিয়ে এসে ওর পিঠ চাপড়াতেই ঠোঁট মুচড়ে একটু হাসল। লটনের পরের বলেই উসমানি ইয়র্কড। ফিরে আসার সময় ওর মুখে নিজের অক্ষমতার জন্য যেন ও নিজেকেই ঘৃণা করছে, এমন একটা যন্‌র্ণায় মোচড়ান রাগ ফুটে উঠে টিভি স্ক্রিনকেও গরম করে দিল।

অনন্ত "আহ্" বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল, যখন উসমানির ব্যাটের তলা দিয়ে বলটা গলে যায়। তার মনে হয়েছিল সেঞ্চুরি পাওয়ার মুখে মনোনিবেশে চিড় ধরে যাওয়ার জন্য নয়, উসমানি আসলে এই ধরনের বল খেলতেই পারে না। বহু ভাল ব্যাটসম্যানেরই অভাবিত ছোটখাটো ব্যাটিং দুর্বলতা থাকে। বোধহয় অস্ট্রেলিয়ানরা উসমানির বর্মের এই ছেঁদাটা আবিষ্কার করে ফেলেছে। অনুশীলন করে এই ত্রুটিটা কাটিয়ে ওঠা যায়। এটা অনুমান-ক্ষমতা আর রিফ্লেক্সের ব্যাপার। এমন ধরনের বলে ওর প্র্যাকটিস নেওয়া উচিত।

ভার্দে আউট হল ৯২ রনে। কাপুর মিড উইকেটে বল ঠেলে অর্ধেক পিচ পর্যন্ত ছুটে গিয়েও ফিরে আসে। ভার্দে তখন মাঝপথে। ফিরে যাওয়ার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে সে বোলার প্রান্তের ক্রিজে ঝাঁপিয়েও পড়ে। কিন্তু তার আগেই উইকেট ভেঙে যায় সরাসরি ছোঁড়া বলে। প্রায় দশ সেকেন্ড সে কাপুরের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। আর তার মধ্য দিয়েই অনন্তর মনে হল, ভার্দে তার বইয়ে কাপুর সম্পর্কে মন্তব্য করার খেসারতই যেন দিল। রানটা স্বচ্ছন্দে সম্পূর্ণ করা যেত, যদি কাপুর ফিরে না আসত। কাপুর এরপর এলোপাথাড়ি ব্যাট চালিয়ে ২৫ বলে ৩৬ রান করে ফিরে যায়। তারপর থেকেই আসা আর যাওয়া শুরু হল। ব্যাটসম্যানদের মেরুদণ্ড যেন পিঠ থেকে খুলে নেওয়া হয়েছে। ব্যাটিংয়ে শৃঙ্খলা নেই, কোনওক্রমে ফিরে যেতে পারলেই যেন বাঁচে! ৩৭৮ রানে দিনের শেষ ওভারে ভারত ভেঙে পড়ল।

ট্রাউজার্সের ট্রায়ালের তারিখ আজই। সন্ধ্যাবেলায় অনন্ত বেরোল

শ্যামবাজারে দর্জির দোকানে যাবার জন্য। বাসে আজকের টেস্ট খেলাটি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। সে কান পেতে শুনল।

"এই তো বাবুদের খেলার ছিরি! রান করার বদলে শুধু টাকা করার ধান্দা।"

"কত করে পায় বলুন তো?"

"টেস্ট ম্যাচ পিছু চোদ্দ হাজার টাকা, তার মানে দৈনিক আঠাশ শো, বুঝলেন? এই গরিব দেশে এক-একটা জিরোর দাম চোদ্দ হাজার আর এরাই নাকি হিরো! আপনার আমার পরিশ্রমের পয়সাই এদের ব্যাঙ্কে জমা হচ্ছে। বিনিময়ে ওরা দিচ্ছে শুধু লজ্জা আর অপমান।"

"আরে মশাই, এত সাহস এদের, বোর্ড যে চুক্তির ফর্ম দিল, তাতে ইচ্ছেমতো চুক্তি কেটে সই করল। ভেবেছে কী?"

"করবে না কেন। ওরা তো জানে, ওদের বাদ দেওয়ার ক্ষমতা বোর্ডের নেই, দেশে আর প্লেয়ার নেই, টিম হবে কী করে? তাই সাহস পেয়েছে।"

"বাজে কথা রাখুন। দেশে আবার প্লেয়ার নেই! দলবাজি করে, পলিটিক্স করে চললে প্লেয়ার পাবে কোত্থেকে? অনেক ভাল-ভাল প্লেয়ার চান্সই পায় না শুধু খুঁটির জোর নেই বলে। এই তো বেঙ্গলে একটা ছেলে রয়েছে কী যেন নাম...."

অনন্ত কাঠ হয়ে রইল নামটা শোনার জন্য। রড-ধরা দুটো হাতের মধ্যে মুখটা চেপে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

"অনন্ত সেন।"

অল্পবয়সী কেউ বাসের এক কোণ থেকে চেঁচিয়ে বলল, "এই দমদমেরই ছেলে। দুর্দান্ত ফাস্ট বোলার, ভারতে এখন ওর ধারেকাছে আসার মতো কেউ নেই। কী স্পিড, কী সুইং, কী কন্ট্রোল, লেংথ আর ডিরেকশনের তো জবাব নেই।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ছেলেটার কথাই বলছি। ভাবুন তো, অল্পবয়সে এখন যদি না চান্স পায়, তা হলে পরে পেয়ে কী খেলা দেখাবে? সুঁটে ব্যানার্জির কথা মনে আছে? কেরিয়ারের একেবারে শেষে একটি মাত্র টেস্ট খেলতে পেলেন। বাঙালি বলেই তো ওকে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল, আর এত বছর পরও তাই চলছে।"

"দাদা, একটা জিনিস টিভিতে লক্ষ করেছেন কি উইকেটগুলো কী ভাবে থ্রো করে গেল ? এই ভাবে ম্যাচ হারা ?"

"এবার বোর্ডের উচিত পুরো টিমটাকে বাতিল করা, একেবারে ফ্রেশ ব্লাড আনা। এরা তো হারছেই, ওরাও নয় হারবে, একই ব্যাপার। তবু আবর্জনাগুলো তো বিদেয় হবে। আমাদের ছেলেদের সামনে কী দৃষ্টান্ত ওরা রাখছে বলুন ?"

"বোর্ড বোধহয় এবার কিছু একটা করবে।"

"ছাই করবে মশাই, এরাই কলকাতায় থার্ড টেস্টে খেলবে। আজ রাতেই টিম অ্যানাউন্স্ড হবে। মিলিয়ে নেবেন যা বললাম।"

"কাপুরকে বসিয়ে অনন্ত সেনকে কলকাতায় খেলানো উচিত। ছেলেটা খারাপ ব্যাটও করে না।"

"আরে দাদা, খেলাবার ইচ্ছে থাকলে এই আন্ডার টোয়েন্টিফাইভের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচেই ওকে খেলাত। জামশেদপুরে এখন ইস্ট জোনের সঙ্গে ম্যাচটায় যদি ও কিছু করে, তা হলে একটা চান্স আছে।"

কথাটা যিনি বললেন, বছর পঁয়ত্রিশের একজন, বোধহয় অফিস থেকে ফিরছেন। আগে হয়তো মাঠে যেতেন এখন কাগজ পড়ে খেলার খবর রাখেন। অনন্তর এটা মনে হল এইজন্যই যে, লোকটির সঙ্গে তার চোখাচোখি হল এবং তাকে চিনতে পারল না। বস্তুত বাসের কেউই তাকে চিনল না। তবে মনে-মনে সে বলল, 'জামশেদপুরের ম্যাচটায় আমি নিজেকে চেনাব।'

॥ সাত ॥

জামশেদপুরে টাটা গেস্ট-হাউসে রাখা হয়েছে পূর্বাঞ্চল দলকে। একতলায় একটা ঘরে অনন্ত আর উইকেটকিপার তরুণ মল্লিক।

"অন্তু, আমি বেরোচ্ছি। খোঁজ করলে বলিস ন'টার মধ্যেই ফিরব।"

বালিশে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে অনন্ত হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কেনা ইংরেজি একটা খেলার সাপ্তাহিক পড়ছিল। দ্বিতীয় টেস্টম্যাচের অনেক ছবি আর খেলার রিপোর্ট রয়েছে।

"খেয়েদেয়ে ফিরবে ?"

"দিদির বাড়ি গেলে কি কেউ না খেয়ে ফেরে ?"

তরুণ বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন অনন্ত ডাকল, "তরুণদা, উইকেট তো দেখলে, কী মনে হল ?"

"এখন কিছু ঘাস রয়েছে, কিন্তু কাল মাঠে গিয়ে দেখবি চেঁছে ন্যাড়া করে দিয়েছে। ফাস্ট বোলারদের, মানে ভিজিটিং টিমের ফাস্ট বোলারদের ভয়ে তিরিশ বছর ধরে আমাদের দেশে এটাই চলে আসছে। এখানেও তাই হবে। কাল সকালে ঘন্টাখানেক একটু লাইফ থাকবে তারপর পেসার, স্পিনার কেউই হেল্প পাবে না। আমার কাজটা একটু কমল।"

"কেন ?"

"বলই তো পাব না। ওরা কি একটাও বল ছেড়ে দেবে ভেবেছিস ?"

তরুণ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর অনন্ত ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইল। মনটা তরুণের কথায় দমে গেল। উইকেট দেখে তারও মনে হয়েছে বোলাররা সাহায্য পাবে না। তবু ভরসা পাবার জন্য তরুণকে জিজ্ঞাসা করেছিল যদি আশাপ্রদ কিছু শোনা যায়। কিন্তু শোনা গেল না।

দরজায় খুট খুট শব্দ হল। আবার কে এল ? পাশের ঘরে রয়েছে ওড়িশার নিরঞ্জন লেঙ্কা আর স্বরাজ দাস কিছুক্ষণ আগে নিরঞ্জন এসেছিল বাড়ির তৈরি জিবেগজা নিয়ে। ভাল লেংথে মিডিয়াম পেসে দুটো সুইংই করায়। অনন্তর জুড়ি হয়ে বোলিং ওপেন করবে। তারপর উঁকি দিয়েছিল বলাই চন্দ, চিউইংগাম পাওয়া যাবে কি না খোঁজ নিতে।

"কাম ইন।" অনন্ত বিছানায় শোওয়া অবস্থাতেই চেঁচিয়ে বলল।

ধীরে-ধীরে, বেশ কুণ্ঠিতভাবেই দরজার পাল্লাটা খুলে যে ঢুকল, তাকে দেখেই অনন্ত ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। একটি মেয়ে, তার পিছনে একটি বছর বারোর ছেলে।

অনন্তর পরনে একটা টি শার্ট আর শর্টস। মাসটা ডিসেম্বর হলেও ঘরের ভিতর দরজা-জানলা বন্ধ থাকায় ঠাণ্ডা প্রায় নেইই। তার প্রথমেই মনে হল, পা দু'টিতে আবরণ দেওয়া উচিত। পায়ের কাছে বেড-কভারটা পড়ে, সে টেনে পা ঢেকে ফেলল।

"আচ্ছা অনন্ত সেন কি এই ঘরে রয়েছেন ?" ঋজু, স্বচ্ছন্দ, ঝরঝরে স্বর

মেয়েটির। বলার এবং দাঁড়াবার ভঙ্গিতে জড়তা নেই।

"হ্যাঁ।" একটা শব্দ মুখ থেকে বার করতে গিয়েও অনন্ত প্রায় ঢোক গিলল। মা আর বয়স্ক কয়েকজন ছাড়া কখনও কোনও মেয়ের সঙ্গে সে কথা বলেনি, তার এই বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত।

"বাইরে গেছেন কি?"

"না।" অনন্ত ঘাবড়ে গেছে। জামশেদপুরের মতো জায়গায়, হঠাৎ একটি অপরিচিত মেয়ে সন্ধ্যাবেলায় ঘরে এসে তার নাম বলে খোঁজ করবে, এটা কল্পনা করার সুযোগ তার জীবনে আসেনি। সুতরাং নার্ভাস সে হতেই পারে।

"উনি এখন কোথায় বলতে পারেন?"

"আ আ আমিই—।"

"আপনি!" মেয়েটি হেসে ফেলেই গম্ভীর হল। "আমাকে আপনি চিনবেন না, স্বাভাবিকই সেটা। কেননা আমাদের এই প্রথম দেখা। আমার নাম ভ্রমরা সমাজপতি। আমার বাবা সিদ্ধেশ্বর সমাজপতি, টেলকোয় আছেন। আপনার বাবা অরুণ সেনের কলেজের বন্ধু ছিলেন আমার বাবা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবার কাছে নাম শুনেছি। উনি তো পরে শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। তারপর বিলেত যান। দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।" অনন্ত তরুণের খাটটা দেখিয়ে দিল।

ওরা দুজন বসল। অনন্তর জড়তা এইবার কাটতে শুরু করেছে। কিন্তু নগ্ন পা দুটো বেডকভার থেকে বার করা উচিত হবে কি না বুঝতে পারছে না। ছেলেটি কৌতূহলভরে তাকে লক্ষ করছে।

"আপনার বাবার কথাও আমি বাবার কাছে শুনেছি। এমন দৃঢ়, সৎ আর প্রখর ইন্টলেক্টের মানুষ বাবা কখনও দ্যাখেননি। চাকরি যদি না ছাড়তেন, তা হলে এখন বছরে দু' লক্ষ টাকা মাইনেতে থাকতেন।"

শুনে খুব ভাল লাগল অনন্তর। বুকের মধ্যে বাতাস জমে উঠে বুকটা যেন ফুলে উঠল। বাবার জন্য গর্ব করার সুযোগ সে পায় না। যাদের সঙ্গে তার মেলামেশা, একমাত্র জীবন ছাড়া, তারা কেউই বুঝবে না অরুণ সেন কী ধরনের মানুষ ছিলেন। হঠাৎ এখন একটি অপরিচিত মেয়ে, যে

চোখেও দ্যাখেনি অরুণ সেনকে, শ্রদ্ধার সঙ্গে বাবার কথা বলায় অনন্ত মনে-মনে কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল।

"একটা বাংলা খবরের কাগজে আপনার সম্পর্কে লেখা হয়েছে। গুনগুন সেটা পড়েছে। এই যে আমার ভাই, ইনিই গুনগুন।"

"মোটেই আমার নাম গুনগুন নয়। আমার নাম সিদ্ধার্থ।" ছেলেটি বিরক্তিভরে শুধরে দিল।

"ইন্টারভিউয়ে আপনি বাবার সম্পর্কে বলেছেন, অনেক কথা, খুবই ফ্যাসিনেটিং। গুনগুন ওটা পড়েই..." ভ্রমরা আড়চোখে ভাইয়ের মুখ দেখে নিল। "সিদ্ধার্থ ওটা পড়েই বাবাকে বলল, তোমার বন্ধুর ছেলে এখানে খেলতে আসছে। বাবা বললেন, এলে ওকে একবার নিয়ে আসিস তো, অরুণের ছেলে কেমন হয়েছে দেখার জন্য কৌতূহল হচ্ছে।"

শোনামাত্রই অনন্তর বুক ঢিবঢিব করে উঠল। দেখা মানেই তো বাবার সঙ্গে তুলনা করবেন, অবশ্য মনেমনেই। আর নিশ্চয়ই বলবেন, "নাহ্ বাপের নখের যুগ্যিও নয়।"

হঠাৎ ঘরের দরজাটা খুলে গেল। নিরঞ্জন ঘরে ঢুকে ওদের দেখেই, "ওহ, সরি।" বলেই ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

অনন্ত অপ্রতিভ বোধ করল এইভাবে নিরঞ্জনের বেরিয়ে যাওয়ায়। নিশ্চয় ও ভেবে নিয়েছে কোনও ফ্যান বা বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলছি, তাই এই সময় ঘরে থাকা উচিত নয়। কিন্তু সে এমন কিছু নামী নয় যে তার ভক্ত তৈরি হবে।

"বাবা আপনাকে একবার যেতে বলেছেন, মাও বলেছেন।"

"কিন্তু..." অনন্ত দ্বিধায় পড়ল। ভ্রমরা তার থেকে বছর তিনচারের ছোটই হবে। শালোয়ার-কামিজের উপর জড়ানো রোঁয়া তোলা পশমের চাদর। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম, মাঝারি উচ্চতা, মুখের গড়ন পানের মতো এবং শক্তসবল। চোখ দু'টি ঝকঝকে ও চঞ্চল। চুল ছেলেদের মতো ছাঁটা। টিকলো নাক, মোটা ভ্রূ, হাতে ঘড়ি ছাড়া কোনও গহনা নেই। প্রসাধনের চিহ্ন নেই কোথাও। খুবই ঘরোয়া এবং মার্জিত ওর ব্যবহার।

"কিন্তু কী ? যেতে কোনও অসুবিধা আছে ? অবশ্য কাল খেলা শুরু হচ্ছে সেজন্য হয়তো..." ভ্রমরা থেমে গেল। অনন্ত জিজ্ঞাসু চোখে

তাকাল।

"শুনেছি খেলার আগে কনসেনট্রেট করার জন্য প্লেয়াররা নাকি নির্জনতা চায়?"

অনন্ত হেসে উঠল।

"বরং গল্পগুজব হইচই পেলে বেঁচে যাই। টেনশনটা থেকে নিজেকে বার করার জন্য অনেকক্ষণ চেষ্টা করছি, আর আপনি তখনই কিনা এঞ্জেলের মতোই বাড়িতে যাবার প্রস্তাবটা নিয়ে এলেন। কিন্তু কথাটা হল, ম্যানেজারের একটা পারমিশন নেওয়া উচিত।"

বেড-কভার সরিয়ে অনন্ত খাট থেকে নামল। ভ্রমরা তাড়াতাড়ি খেলার ম্যাগাজিনটা তুলে মাথা ঝুঁকিয়ে পাতা ওলটাতে শুরু করল। অনন্ত জিন্‌সটা নিয়ে ওদের পিছনে গিয়ে চট করে পরে ফেলে, আয়নায় একবার মুখটা দেখে নিল।

"আমি আসছি।"

দোতলায় ম্যানেজার ভবেন মহান্তি তাঁর ঘরে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কথার টুকরো কানে যেতেই অনন্ত বুঝল কমপ্লিমেন্টারি টিকিটের জন্য ধরাধরি চলছে। ভবেনদা মৃদুভাষী, ভালমানুষ। অনুমতি দিয়ে বললেন, "শুধু মনে রেখো, কাল হান্ড্রেড পারসেন্ট ফিট অবস্থায় মাঠে নামতে হবে।"

"নামব। কিন্তু প্লেয়াররা কি তাদের গেস্টদের খেলা দেখাতে পারবে না?"

ভবেনদা বিব্রত হলেন। ঘরের লোকদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, "পরে কথা বোলো। এখন কোনও টিকিট আমার কাছে নেই।"

অনন্ত নীচে ঘরে এসে বলল, "চলুন যাওয়া যাক। একটা কথা, আমি কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে চাই, ন'টার মধ্যে হলে ভাল হয়।"

"আমি পৌঁছে দিয়ে যাব।" ভ্রমরা উঠে দাঁড়াল। "বাবাও বলেছিলেন, খেলার সময় আর্লি শুতে যাওয়া দরকার।"

বাইরে একটা ফিয়াট দাঁড়িয়ে। ড্রাইভারের পাশের সিটের দরজাটা খুলে ধরেছে ভ্রমরা। অনন্ত উঠে পড়ল, ভ্রমরা গাড়িটা ঘুরে গিয়ে ড্রাইভারের সিটে বসল। পিছনে উঠল সিদ্ধার্থ।

প্রণাম করে দাঁড়াতেই ভ্রমরার মা মৃণাল প্রথমেই বললেন, "কী লম্বা !"

"বাবার মতোই।" সিদ্ধেশ্বর বললেন।

তিনি অনন্তকে দেখামাত্রই স্মৃতিভারে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, সেটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কলেজের দিনগুলোকে যেন ফিরে পেয়েছেন অনন্তকে উপলক্ষ করে। তিনি একাই কথা বলে যেতে লাগলেন। অরুণ সেনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের নানান গল্প শুনতে-শুনতে অনন্ত হালকা বোধ করতে লাগল। সিদ্ধেশ্বরকে তার দিলখোলা, প্রাণবন্ত, ব্যক্তিত্ববান মনে হল আর মৃণালকে আটপৌরে, ঘরোয়া। সে কয়েক মিনিটেই স্বচ্ছন্দ হয়ে পড়ল।

"বাবা একদিন বলেছিলেন, লাখ টাকা আমার দরকার নেই, কিন্তু আমার ভীষণ দরকার নিজেকে নিজের ভাল-লাগা।"

সিদ্ধেশ্বরের তাই শুনে উজ্জ্বল চোখে স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রের দিকে তাকিয়ে চাপা গর্বভরে বললেন, "শুনলে ! যা বলতাম অরুণ সম্পর্কে এইবার মিলিয়ে নাও।"

"খুব শক্ত ব্যাপার।" ভ্রমরা বলল। "নিজেকে ভাল-লাগা, নিজেকে শ্রদ্ধা-করা, অত্যন্ত ক্লিন না হলে তা করা সম্ভব নয়।"

"আদর্শের জিনিসমাত্রই উঁচুতে থাকে, পৌঁছানো অসম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু তাই বলে তো পিছিয়ে যাওয়া যায় না। চেষ্টা করতে হবে পৌঁছতে, আর সেটা একটা লড়াইয়ের মতোই ব্যাপার। নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই, তাই না কাকাবাবু ?" অনন্ত তাকাল সিদ্ধেশ্বরের দিকে।

"শুধু নিজের সঙ্গেই নয়, অন্যের সঙ্গেও লড়ে এবং জিতে নিজেকে ভাল-লাগাতে হয়। তুমি যদি এই ম্যাচটায় দারুণ খেলতে পারো তা হলে দেখবে, তোমার বাবার কথাটাই সত্যি হয়ে উঠবে।"

"অনন্ত, তুমি কিন্তু খেয়ে যেও।" মৃণালের এই অনুরোধটা যে আসবে অনন্ত তা ধরেই নিয়েছিল। সে মাথা নেড়ে বলল, "খুব অল্প কিন্তু।"

খাবারের টেবিলে অনন্তর পাশে বসল সিদ্ধার্থ। ওর সঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোনও কথাই হয়নি। বলা উচিত, এই ভেবে অনন্ত শুরু করল।

"তুমি ক্রিকেট খেলো ?"

"হুঁ।"

"গুনগুন তো ক্রিকেটের পোকা। শুধু কি খেলা নাকি! এখানে-ওখানে দেওয়ালে ছবি আঁটা আর খেলার বই নিয়ে পড়া, এ ছাড়া ওর আর কোনও কাজ নেই।" মৃণাল রান্না-করা খাবারের বাটিগুলো টেবলে সাজাতে-সাজাতে স্নেহ-ভরা অনুযোগ করলেন।

"স্কুলে ক্রিকেট কুইজ কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছে।" সিদ্ধেশ্বর জানালেন। সিদ্ধার্থ লাজুক মুখটা নামিয়ে রাখল।

"তাই নাকি!"

"রাতে কী খাও, ভাত না রুটি?" মৃণাল জিজ্ঞাসা করলেন।

"রুটি। আচ্ছা গুনগুন, না না, সিদ্ধার্থ, আমি তোমায় প্রশ্ন করব, দেখি কেমন পারো। করব?"

সিদ্ধার্থ সন্দিগ্ধ চোখে একবার তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

"আচ্ছা বলো, দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারত কখনও টেসটম্যাচ খেলেনি। কিন্তু একজন ভারতীয় একটা টেস্ট খেলেছেন, কে তিনি?"

সিদ্ধার্থর চোখ ঝলসে উঠল। গম্ভীর হয়ে বলল, "দলিপ সিংজি। ইংল্যান্ডের হয়ে সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলেছেন। সালটা মনে নেই।"

"উনিশশো উনত্রিশ সালে। আচ্ছা এবার বলো, হাই-ফাইভ কাকে বলা হয়?"

কিছুক্ষণ ভেবে সিদ্ধার্থ মাথা নাড়ল। জানে না।

"ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের নিশ্চয় টিভি-তে দেখেছ উইকেট পেলেই ওরা ছুটে গিয়ে কেমন হাত তুলে পরস্পরের তালুতে চাপড় দেয়। একেই বলে হাই-ফাইভ। কথাটা এসেছে আমেরিকান বাস্কেটবল থেকে।"

ফুলকপির ডালনাটা অনন্তর খুব ভাল লাগছে। সে হাতা দিয়ে আরও খানিকটা প্লেটে তুলে নিয়ে আবার বলল, "আচ্ছা বলো, ট্রিমার কাকে বলে?"

সিদ্ধার্থ এবারও মাথা নাড়ল।

"অত্যন্ত ভাল একটা ফাস্ট বলকে ট্রিমার বলা হয়, বিশেষ করে যেটা একচুলের জন্য স্টাম্প মিস করেছে।"

"অনন্ত তুমি তো ফাস্ট বোলারই?" সিদ্ধেশ্বর বললেন।

"হ্যাঁ।"

"তোমার কাছ থেকে তা হলে ট্রিমার দেখা যাবে।"

"চেষ্টা করব। আপনি কাল মাঠে যাচ্ছেন?"

"না। কাল সকালেই কলকাতায় যেতে হবে। মাঠে যাবে গুনগুন। ট্যুর ফিকশ্চার কাগজে বেরনো মাত্রই টিকিটের কথা বলে রেখেছে।"

"আপনারা?"

"অতক্ষণ মাঠে বসে থাকতে ভাল লাগে না। কই চিকেন নিলে না যে?"

"না কাকিমা, কপিটা এত সুন্দর রান্না হয়েছে, এটা দিয়েই খাওয়া সারব। নিরামিষ আমার ভাল লাগে।" এই বলে সে ভ্রমরার দিকে তাকাল।

"বাবার কমপ্লিমেন্টারিটা রয়েছে। তবে এখনও ঠিক করিনি, মাঠে গিয়ে দেখব না টিভি-তে দেখব।"

"আর একটা বলুন না।" সিদ্ধার্থ মিনতি জানাল। স্কুলে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য সে কুইজ সংগ্রহ করতে চায়।

অনন্ত কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, "আনলাকি থার্টিনের মতোই অপয়া হিসেবে ক্রিকেটে ১১১ সংখ্যাটাকে নেলসন বলা হয়। নেলসন কেন?"

টেবলে সবাই কৌতূহলী চোখে অনন্তর দিকে তাকাল। সে জানতই প্রশ্নটার উত্তর সিদ্ধার্থ দিতে পারবে না। ভ্রমরার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি? ক্রিকেট না জানলেও এটা পারা যাবে।"

মুখটা লাল হয়ে গেল ভ্রমরার। মাথা নাড়ল।

"নেলসন হলেন বিখ্যাত ইংরেজ অ্যাডমিরাল নেলসন। ইংরেজদের মধ্যে একটা ধারণা চালু আছে যে, তাঁর একটা হাত, একটা পা আর একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছল। এক এক এক, নুলো, খোঁড়া, কানা— সুতরাং ১১১ সংখ্যাটা অপয়া। কোনও ব্যাটসম্যানের কিংবা দলের স্কোর ১১১ হলেই নেলসন হয়েছে বলা হয়। মজার কথা, নেলসন একটা চোখ আর একটা হাত হারিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু পা দুটো আস্তই ছিল।"

"আমি কি প্রশ্ন করতে পারি? ক্রিকেট না জানলেও পারা যাবে।"

ভ্রমরার কথার সুরেই অনন্ত বুঝল শোধ নিতে চাইছে এবং এমন প্রশ্ন

করবে যার জবাব দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

"বলুন।"

"কোন্ বছর থেকে ভারতে রবিবারটা ছুটির দিন হিসেবে চালু হয়েছে?"

"স্টাম্পড হয়ে গেছি।"

"আঠারোশো তেতাল্লিশ থেকে। আচ্ছা বলুন, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মাইনে কত?"

"বোল্ড আউট।"

"বছরে দু' লক্ষ ডলার। এবার বলুন, স্যাটেলাইট থেকে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম সিগন্যাল সার্ভিস ব্রডকাস্ট করে ভারত এ ব্যাপারে পৃথিবীতে দ্বিতীয় দেশ হিসাবে গণ্য হয়েছে। প্রথম দেশটা কে?"

"রান আউট হলাম।"

"আমেরিকা। ভারতের এই স্যাটেলাইটের নাম কী?"

"ব্যাট প্যাড ক্যাচ আউট।"

"ইনস্যাট ওয়ান বি। আচ্ছা আর একটা, এটা খেলারই প্রশ্ন, পারা উচিত।" ভ্রমরা খুব মন দিয়ে চাটনি মাখানো আঙুল চুষতে-চুষতে বলল, "কোন্ খেলায় বিজয়ী দলকে সামনে না গিয়ে পিছনে যেতে হয়?"

অনন্ত ভাবতে শুরু করল এবং কূলকিনারা না পেয়ে ভ্রমরার দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসল।

"এবার কী আউট?"

"টাইম্ড আউট। সত্যিই তো, পিছনে গেলে জিতবে এমন খেলা.... !"

"রোইং আর টাগ অব ওয়ার।"

"আমি একটা গর্দভ।"

"আরও করব?"

"না না না, এবার ইনিংস ডিক্লেয়ার করুন, আর ফিল্ডিং খাটতে পারছি না।"

গাড়ি চালিয়ে ভ্রমরা পৌঁছে দিচ্ছিল অনন্তকে। পিছনে সিদ্ধার্থ।

"আপনি রেগে গেছলেন।"

"ওইটুকু ছেলে অত শক্ত-শক্ত প্রশ্নের কি উত্তর দিতে পারে ? আর 'ক্রিকেট না জানলেও পারা যাবে' বললেন কেন ? কোটি কোটি কুইজ প্রশ্ন হয়, সবাই কি উত্তর দিতে পারে ?"

অনন্ত চুপ করে রইল। পিছন থেকে ঝুঁকে সিদ্ধার্থ বলল, "আমাকে আরও গোটাকতক কুইজ দেবেন ?"

"দোব। পরে।"

"অস্ট্রেলিয়ান প্লেয়ারদের অটোগ্রাফ জোগাড় করে দেবেন ?"

"গুনগুন !" ভ্রমরা কঠিন চাপা স্বরে ধমকে উঠল। "তোমাকে বলেছি না, এটা একটা বাজে হবি। অন্যের অটোগ্রাফ নেওয়ার থেকে নিজে যাতে অটোগ্রাফ দিতে পারো সেই চেষ্টা করো। নিজে হিরো হয়ে ওঠার জন্য ঘাম ঝরাও।"

অনন্ত অবাক হয়ে যাচ্ছিল ভ্রমরার কথা শুনতে-শুনতে। অনেকটা যেন বাবার মতো কথা এই মেয়েটির মুখ থেকে বেরোচ্ছে ! শ্রদ্ধা তো বটেই, সমীহও তার মনে জাগছে।

"আপনি কোথায় পড়েন ?"

"যাদবপুরে, বি-এ। আমার মাসির বাড়ি হিন্দুস্থান পার্কে, তার কাছেই থাকি।"

"আমাদের বাড়ি দমদমে, একদিন আসুন না, মা'র খুব ভাল লাগবে আপনাকে।"

"কী করে জানলেন ?"

অনন্ত চুপ করে রইল। শুধু মনে-মনে বলল, আমি তো মাকে জানি।

"যাব। খেলাটা হয়ে গেলে আর একবার আসুন না।"

"যাব।"

গেস্ট-হাউসের সামনে গাড়ি থামল। গাড়ি থেকে নেমে ঝুঁকে জানলায় মুখ এনে অনন্ত বলল, "কাল প্রথম দিন মাঠে আসুন না।"

"চেষ্টা করব। ... আচ্ছা যাব। গুড নাইট।"

"গুড নাইট। সিদ্ধার্থ তোমাকেও।"

গাড়ি ঘুরিয়ে ভ্রমরারা চলে গেল। যতক্ষণ দেখা যায় দেখে অনন্ত জগ করে তার ঘরের সামনে এসেই নিরঞ্জনের মুখোমুখি হল।

"তুই তখন ঘর থেকে ওভাবে বেরিয়ে গেলি কেন ?"

"আমি ভাবলাম, তোর কোনও...., তাই আর ভিড় বাড়ালাম না।"

"বাবার বন্ধুর মেয়ে।"

"ইস্‌স্‌। মিসটেক করে ফেলেছি তো।"

অনন্ত দরজার হাতল ঘোরাল।

"খেতে যাবি না ?"

"না, সেরে এসেছি।"

ঘরে ঢুকেই সে থমকে গেল। তার বিছানায় বসে রয়েছে জীবন।

"কোথায় গেছলি, এক ঘণ্টা বসে আছি।"

"তুই কোথায় এতদিন ডুব দিয়ে ছিলি ? কাকিমা বললেন ব্যবসার কাজে বাঙ্গালোর গিয়েছিলি। ফিরেছিস তো সাতদিন আগে! এখানে কোথায় উঠেছিস ? খেলার টিকিট ?"

"আছে। আছে। জামশেদপুরে টিকিটের জন্য, থাকার জন্য আমায় ভাবতে হয় না। একটা কথা বলতে এলাম, উইকেটে ঘাস দেখেছিস তো ? এই ঘাস থাকবে।"

"অ্যাঁ, তরুণদা যে বলল থাকবে না!"

"তরুণদা জানে না। ভেতরের খবর তোকে বলছি। বোর্ড থেকে স্ট্রিক্ট নির্দেশ এসেছে ঘাস ছাঁটা হবে না। তুই হেল্প পাবি।"

"লটন, ব্রাইট, অ্যামরোজরাও হেল্প পাবে।"

"পাবে। তাতে তোর কী ? তুই নিজের কাজ গুছোবি। তোর উইকেট তোলার কথা, তুলবি।"

জীবন উঠে দাঁড়াল।

"চললি ?"

"হ্যাঁ, আবার দেখা হবে কলকাতায়। এই ক'দিন আর আসব না। খেলা শেষ হলেই গাড়িতে ফিরে যাব।"

দরজার কাছে গিয়ে জীবন ফিরে তাকাল। "তোর ঘরে একটা মেয়ে এসেছিল নাকি ?"

"কে বলল, নিরঞ্জন ?"

"যেই বলুক, এসব কী ? তোর তো এসব ব্যাপার কখনও ছিল না।

তুই কি এখনই টেস্ট-প্লেয়ার হয়ে গেছিস, ভাবতে শুরু করেছিস ? কাল তোর জীবনের সবথেকে ভাইটাল ম্যাচ। ট্রাই টু কনসেনট্রেট, আজেবাজে চিন্তা মন থেকে তাড়া, ট্রাই টু কনসেনট্রেট। একটিও কথা আর নয়, শুয়ে পড়।"

তীব্র চোখে তাকিয়ে, তীব্র স্বরে কথাগুলো বলেই জীবন ঘর থেকে বেরিয়ে শব্দ করে দরজা বন্ধ করল। অনন্তর মুখ ধীরে-ধীরে হাসিতে ভরে গেল। জীবন তা হলে রাগ-অভিমান কিছুই করেনি। আবার পুরনো ফর্মে ফিরে এসেছে। সেই জীবন, যে ঘিরে রেখেছে অনন্তকে।

ঘড়িতে দেখল সাড়ে ন'টা। তরুণদা এখনও ফেরেনি। অনন্ত আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। কনসেনট্রেট করতে হবে। ছাই হবে। সার-সার কথা আর মুখের মিছিল চলেছে। 'কী লম্বা!' ... 'যা বলতাম অরুণ সম্পর্কে মিলিয়ে নাও' ... 'তুমি যদি এই ম্যাচটায় ভাল খেলতে পারো তা হলে দেখবে তোমার বাবার কথাটাই সত্যি হয়ে উঠবে' ... 'চেষ্টা করব, আচ্ছা যাব, গুডনাইট।'

ঘুমে আচ্ছন্ন হতে-হতে অনন্ত টের পেল ভবেনদা দরজা খুলে ঢুকলেন। তার গায়ের কম্বলটা ঠিক করে দিলেন।

॥ আট ॥

"আমরা ভেবেছিলাম তুমি কাল রাতে একবার আসবে।" মৃদু অনুযোগ করলেন মৃণাল। কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বসিত উত্তেজনা।

"অফিসিয়াল ডিনার ছিল, না গিয়ে উপায় নেই।" অনন্তর কুণ্ঠিত উত্তর।

"তা বটে। বিশেষ করে তোমার হাজিরাটা তো অবশ্যই.....মাস্ট। ম্যান অব দা ম্যাচ, ডিনারে না থাকলে তো...।"

"শিবহীন যজ্ঞ।" ভ্রমরা বলল।

"সেই রকমই। শেষ দুটো ঘণ্টা তো দক্ষযজ্ঞই হল। টিভি থেকে পলকের জন্য চোখ সরাতে পারিনি, আর খালি মনে হচ্ছিল, ইস্‌স্ খেলা দেখতে মাঠে গেলাম না কেন!" মৃণালের চোখ-মুখ ছেয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্য আপশোষ ঘনিয়ে উঠেই রৌদ্রের মতো ঝলমল করে

উঠল আনন্দ।

"সিদ্ধার্থ কোথায় ?" অনন্ত জানতে চাইল।

"তুমি আসবে জানলে ও আজ বাড়ি থেকে বেরোতোই না। আসবে এখনই, বন্ধুদের কাছে গেছে। কাল যদি ওকে দেখতে—অন্তুদা, অন্তুদা আর অন্তুদা, যেন ওর পার্সোনাল প্রপার্টি।"

"ফোন বেজে উঠল। ঘরের কোণে দেওয়াল-তাকে রাখা টেলিফোন। ভ্রমরা উঠে গেল।

"তুই কোথা থেকে বলছিস ?".....হ্যাঁ আমাদের এখানেই তো রয়েছে.....আচ্ছা আচ্ছা থাকতে বলব।"

ফোন রেখে এসে ভ্রমরা হাসতে হাসতে বলল, "গুনগুন। আপনার খোঁজেই গেস্টহাউসে গেছে। এখনই আসবে আপনাকে অপেক্ষা করতে বলল।"

"কিন্তু আমি তো একটু পরেই কলকাতা রওনা হব, আমার এক বন্ধুর মোটরে। কাল খেলা শেষ হতেই ও চলে যাবে বলেছিল। কিন্তু...।" কথা শেষ না করে অনন্ত হাসল।

"সে কী, তুমি এখনই চলে যাবে নাকি ! দুপুরে এখানে খেয়ে যাবে না ?"

"না কাকিমা, ওর সঙ্গে আমাকে ফিরতেই হবে।"

"মৃণাল পীড়াপীড়ি করলেন না। শুধু বললেন, "খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ?"

"ঘনিষ্ঠ বললে কমই বলা হবে।"

এরপর অনন্ত ধীরে ধীরে বলে গেল জীবনের কথা। স্কুটার দুর্ঘটনা, হাত কেটে বাদ দেওয়া থেকে গতকাল খেলার শেষ বল হওয়ার পর যখন পূর্বাঞ্চল টিম মাঠ থেকে বেরিয়ে আসছে, তখন জীবনের সঙ্গে দেখা হওয়া পর্যন্ত, তাদের বন্ধুত্বের কিছু কিছু কথা, কিছু কিছু ঘটনা। ওরা দু'জন গভীরভাবে শুনছিল।

"আহা বেচারি !" মৃণাল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "টেস্ট খেলার স্বপ্ন কীভাবে চুরমার হয়ে গেল।"

"আমাকে যেভাবে আগলে আগলে চলে, মাঝে-মাঝে আমার হাসি পায়, রাগও ধরে। যেখানেই যাই না কেন ঠিক খোঁজ রাখে, কখন খাচ্ছি,

কখন ঘুমোচ্ছি, প্র্যাকটিস ঠিক মতো করছি কি না। এমনকী কার-কার সঙ্গে কথা বলি, তারও খবর রাখে। এই তো সেদিন…"বলতে গিয়েও অনন্ত থেমে গেল।

ওরা দু'জন উৎসুক চোখে তাকিয়ে জীবনের কথা শোনার জন্য। ভ্রমরা তার ঘরে আসার জন্য জীবন তাকে ধমকেছে, এটা তো কিছুতেই এদের বলা যাবে না! অনন্তকে রক্ষা করতেই যেন হইচই করে চার-পাঁচটি ছেলে বাড়িতে ঢুকল। তাদের নেতৃত্বে গুনগুন। অনন্ত লক্ষ করল ওদের হাতে স্কুলের নোটবই, নয়তো সাদা কাগজ, একজনেরই শুধু অটোগ্রাফ বই।

অনন্ত মুখ টিপে হেসে ভ্রমরাকে বলল, "সই নিতে এসেছে।"

"দিন।"

"কিন্তু আমি কি হিরো?"

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে মৃণাল জিজ্ঞাসু চোখে দুজনের মুখের দিকে তাকালেন।

"উনি আমাকে একটু চিমটি কাটলেন।" ভ্রমরা ছদ্ম গাম্ভীর্য নিয়ে মাকে বলল। "গুনগুন ওঁর অটোগ্রাফ চেয়েছিল, আমি বারণ করেছিলাম। নিজে হিরো হয়ে অটোগ্রাফ দেবে, কিন্তু নেবে না বলেছিলাম। সেই কথাটাই উনি ফিরিয়ে দিলেন।"

"কিন্তু আমি কি হিরো?"

"পঁচাশি রান করলে অস্ট্রেলিয়া জিতবে এমন অবস্থায় আটটা উইকেট নিয়ে যে লোকটা ওদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিল, বোধহয় তাকে হিরো বলা যায়, কি মা?"

"ভ্রমরা, বলছিস কী তুই।"

"অ্যাই, সবাই এগিয়ে এসো।" হাত নেড়ে ভ্রমরা ছেলেদের ডাকল। "হিরো মশাইয়ের হাত নিশপিশ করছে সই দেবার জন্য।"

অনন্ত সই দিল, বাংলায়। একজন অনুরোধ করল চারটে সইয়ের জন্য। বন্ধুদের উপহার দেবে। ওরা সই নিয়ে দাঁড়িয়ে, বোধহয় কথা বলতে চায়।

"কিছু বলবে?" অনন্ত জিজ্ঞাসা করল।

"আচ্ছা আঙ্কল আপনি শুধু একটা ছয় মারলেন কেন?"

"আর ছয় মারার বলই পেলাম না, পরের বলেই যে স্টাম্পড হয়ে গেলাম।"

"আপনি ভগবানকে ডাকছিলেন, যখন সকালে উইকেট পাচ্ছিলেন না ?"

"না।"

"আপনি রোজ প্র্যাকটিস করেন ?

"রোজ কি সম্ভব। তবে রোজ ব্যায়াম করি, দৌড়ই।"

"তা হলে ফাস্ট বোলার হতে পারব, যদি আমিও রোজ ব্যায়াম করি, দৌড়ই ?"

"ছেলেটির আগ্রহভরা, আকুল মুখ অনন্তকে মমতায় জড়িয়ে ফেলল। "তুমি বুঝি ফাস্ট বোলার হতে চাও ?"

"হ্যাঁ আপনার মতো।"

"তা হলে রোজ ব্যায়াম করো, দৌড়ও, বল করো। নিশ্চয় হবে।"

"আপনি রবারের বলে খেলেছেন ?"

"যখন তোমাদের মতো ছোট ছিলাম, খেলেছি।"

"আপনাকে বাবা বকতেন খেলার জন্য ?"

"না।"

"আপনি টেস্টম্যাচ খেলবেন ?"

"খেলাটা তো আমার ইচ্ছায় হবে না। যদি টিমে নেয় তা হলে খেলব।"

"আপনার বাড়িতে কে-কে আছেন ?"

"আমি আর মা। বাবা মারা গেছেন।"

"আর নয়।" মৃণাল দু'হাত তুলে ওদের থামালেন। "এবার তোমরা এসো। ওকে এখনই কলকাতা যেতে হবে।"

অনন্ত ঘড়ি দেখল। উঠে দাঁড়াল,

"জীবন বোধহয় এসে গেছে। একসঙ্গে খাবার কথা। আমি এখন আসি।" অনন্ত প্রণাম করল।

"কী ভাল যে লাগল বাবা। বড় হও, অনেক বড় হও। দেশের মুখ উজ্জ্বল করো। এখানে এলেই কিন্তু চলে আসবে।"

"একটু দাঁড়ান, গাড়িটা বার করি, পৌঁছে দিয়ে আসি।

"আমিও যাব।" গুনগুন লাফিয়ে উঠল।

গেস্টহাউসের কাছাকাছি এসে, দূর থেকে জীবনের প্রিমিয়ারটাকে রাস্তার একধারে দেখেই অনন্ত ব্যস্ত হয়ে বলল, "এখানে, এখানেই থামব।"

"সে কী, দরজা পর্যন্ত যাব না?" ভ্রমরা একটু অবাক হয়েই গাড়ি থামাল।

অনন্ত ওকে বলবে কী করে যে, জীবন যদি দেখতে পায় একটি মেয়ে গাড়ি চালিয়ে তাকে পৌঁছে দিচ্ছে, তা হলে প্রচণ্ড ধমক খেতে হবে। কে জানে হয়তো গাড়িতেই জীবন বসে রয়েছে।

"আমার রোজ জগ্ করা অভ্যেস, না করলে খিদেটা ঠিকমতো হয় না। আজ করা হয়নি, তাই একটু জগ্ করেই যাব।" অনন্ত ডিসেম্বরেও ঘেমে উঠল।

গাড়ি থেকে নেমে সে হাত নেড়ে বিদায় জানাতেই ভ্রমরা বলল, "শুনুন।"

অনন্ত গাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে এল। ভ্রমরা একটা চামড়া-মোড়া সুন্দর ডায়েরি জানলা দিয়ে এগিয়ে ধরে বলল, "একটা অটোগ্রাফ, আমার জন্য।"

"অ্যাঁ!"

কলম এগিয়ে ধরে ভ্রমরা বলল কলকাতায় আমারও তো বন্ধুবান্ধব আছে। তাদের দেখাতে হবে না?"

সই করার আগে কী ভেবে অনন্ত পাতাগুলো ওলটালো, মুক্তোর মতো হাতের লেখা ইংরেজি ও বাংলায়।

"উঁহু, দেখবেন না। পার্সোনাল কথাবার্তা আছে।"

"না না, দেখিনি।"

"দু'ছত্র কিছু লিখেও দেবেন, আর ঠিকানাটাও।"

"কী লিখব?"

"যা মনে আসে।"

ডায়েরিটা ফেরত দিয়েই অনন্ত প্রায় পালাবার মতোই জগ

করতে-করতে গেস্টহাউসের দিকে ছুটল। কী লিখেছে দেখার জন্য ভ্রমরা ডায়েরি খুলল : "আমার সব ম্যাচে আপনি মাঠে থাকুন।"

"কী লিখেছে দিদি ?" গুনগুন ঘাড়ের কাছে ঝুঁকে পড়ল। ডায়েরি বন্ধ করে ভ্রমরা এঞ্জিন চালু করতে করতে বলল, "কিছু না।"

অনন্তর বিছানায় জীবন শুয়ে ছিল। অন্য খাটে তরুণ তখনও ঘুমোচ্ছে। অনন্ত কাল রাত দশটার মধ্যেই ঘরে ফিরে এসেছে, সে জানে না কত রাত পর্যন্ত বিজয়োৎসব চলেছে।

"তোর যা কিছু সব গুছিয়ে ভরে নিয়েছি, তবু একবার দেখে নে আর ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে বলে আয়, যাচ্ছি। এখনই খেয়ে বেরোলে সাতটা, সাড়ে সাতটা নাগাদ পৌঁছে যাব।"

প্রায় একঘণ্টা গাড়ি চালাবার পর জীবন বলল, "আমি এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না।"

অনন্তর মুখে হাসি ফুটল, "আমিও না।"

"ম্যাচটাকে ওরা গুরুত্ব দেয়নি। গ্রিন টপ দেখেও বোলান খেলাল না লটন আর ব্রাইটকে। বোধহয় ভেবেছিল, দুটো স্পিনার এবারও বাজি মেরে দেবে।"

"কিন্তু লেসলি আর ম্যাড্রফকে বাদ দিলে অস্ট্রেলিয়া পুরো সেকেন্ড টেস্টের টিমটাকেই নামিয়েছে।"

"তাই তো বিশ্বাস করতে পারছি না। পুরো টেস্ট ব্যাটিং লাইন-আপ্‌কে তুই উড়িয়ে দিলি কী করে ?"

অনন্ত হাসল। তাকে ক্লান্ত, শুকনো দেখাচ্ছে। বলল, "তাই তো, কী করে ওড়ালাম! আচ্ছা ভেবে দেখি।"

অনন্ত চোখ বুজে মাথাটা পিছনে হেলিয়ে দিল।

॥ নয় ॥

বোলান টসে রাহুল শর্মাকে হারিয়ে ফিল্ড করাটাই পছন্দ করেছিল। অ্যামরোজ আর স্টিল বোলিং ওপেন করে। অ্যামরোজ প্রথম চার ওভারেই দু'জনকে ড্রেসিংরুমে পাঠিয়ে দেয়। এল বি ডবলু দুজনেই। প্যাভিলিয়নটা স্কোয়ার লেগের দিকে। সেখানে থেকে বলের মুভমেন্ট

বোঝা না গেলেও, অনন্ত বলের বাউন্স আর পিচ থেকে বলের গতি বুঝতে পারছিল। ফিসফিস করে পাশে-বসা তরুণ মল্লিককে সে বলে, "কী বুঝছ তরুণদা, তোমার কাজ কমল না বাড়ল ? ন্যাড়া কোথায়, এতো দিব্যি মাথাভর্তি চুলেভরা উইকেট !"

"তাই তো রে ! দুদিনেই তো ম্যাচ শেষ হয়ে যাবে। সাত বছর রঞ্জি খেলছি, এমন উইকেট কখনও দেখিনি। ইনিংসেই হারব।"

"জিততেও তো পারি।"

তরুণ ভ্রূ তুলে অনন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ঠোঁটের কোণ মুচড়ে।

"তুই তো সাতে ব্যাট করবি, প্যাড পরে নে।"

"তৃতীয় উইকেটে ৪৫, চতুর্থ উইকেটে ৪০ রান তুলে পূর্বাঞ্চল চায়ের সময় ছয় উইকেটে ১২১। অনন্তর তখন দুই। মাঠ থেকে ফেরার সময় চোখে পড়ল কমপ্লিমেন্টারি এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে আসছে ভ্রমরা। তাকে দেখে মাথাটা হেলাল। অনন্ত দাঁড়িয়ে পড়ল ফেন্সিংয়ের ধারে।

"তা হলে চেষ্টা করে খেলা দেখতে এলেন ?"

"লাঞ্চের সময় এসেছি, এখন চলে যাচ্ছি।"

"আমার আউটটা দেখেই বরং যান।"

ভ্রমরা তাই করল। অবশ্য সেজন্য তাকে প্রথম দিনের খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকতে হল। চায়ের ঠিক একঘণ্টা পর পূর্বাঞ্চল-ইনিংস শেষ হল আরও ৮০ রান যোগ করে এবং তাতে অনন্তর রানই ৬৫। পাঁচটা ছয়, পাঁচটা চার, ৪১ বল পরিচ্ছন্ন ভাবে খেলে এবং শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ৬৭। পূর্বাঞ্চলের যে ২০১ রান উঠবে, কেউই তা আশা করেনি। যেমন কেউই ভাবেনি কুড়ি মিনিটের ব্যাটিংয়ে অস্ট্রেলিয়া ২৫ রানে রজার্স আর বোলানকে হারাবে, অনন্তর প্রথম বাইশ বলেই। রজার্স গালিতে, বোলান ডিপ স্কোয়ারলেগে ক্যাচ দিয়েছিল।

ভ্রমরাকে সে দেখতে পেয়েছিল এবং জীবনকেও। ভ্রমরা চেয়ার থেকে ওঠেনি, শুধু মাথাটা হেলায় আর জীবন গম্ভীর মুখে সেটাই লক্ষ করে যাচ্ছিল।

রাতে শোবার আগে তরুণ মুখে ক্রিম ঘষতে ঘষতে বলল, "অন্তু অত উঁচুতে আর বাউন্সার তুলিসনি। দেখলি তো ব্যাটসম্যান মাথাও নামাল না, আমিও লাফিয়ে একটা তো ধরতেই পারলাম না, চারটে বাই হয়ে গেল। তোর একটা স্লোয়ার বাউন্সার আছে। খুব কাজে দেবে যদি মিশিয়ে দিতে পারিস।"

দ্বিতীয় দিন চাঞ্চল্যকরভাবে শুরু হয়। গতদিনের অনন্তর চতুর্থ ওভারটা শেষ হয়নি, দুটো বল বাকি ছিল। আরউইনের সঙ্গে মিস্টার ব্যাট করতে আসে এবং অনন্তর বল ফস্কে দ্বিতীয় বলে বোল্ড। তিন উইকেটে ২৫ থেকে, আরউইন, উডফোর্ড আর টুমি লাঞ্চে স্কোর নিয়ে গেল ১০৫-এ। উডফোর্ড রান আউট, টুমিকে তরুণ ধরল নিরঞ্জনের বলে। অনন্ত এগারো ওভার বল করে আর উইকেট পায়নি।

লাঞ্চের পর অস্ট্রেলিয়া রান সংগ্রহের গতি বাড়াল আর উইকেটও হারাতে শুরু করল। নিরঞ্জন আবার একটা পেল। রাহুল তার অফব্রেকে প্রিধামকে পেল প্রথম স্লিপে। চায়ের কুড়ি মিনিট আগে অনন্ত বল নিল তার তৃতীয় স্পেলে। তখন তার ফিগার ছিল ১৯-৪-৫১-৩। মাঠের উত্তর দিকে, অনন্ত যখন ওভার শুরু করার জন্য বোলিং-মার্কে যেতে যেতে দলমা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ইয়র্কার না অফ কাটার দিয়ে শুরু করবে ভাবছে, মৃদুমন্দ বাতাস মুখে লাগছে, তখন হঠাৎ কে যেন চিৎকার করে বলল, "অনন্ত সেন মুড়িয়ে দে ওদের।"

চমকে উঠেছিল অনন্ত। শামিয়ানার নীচে কাঠের গ্যালারি। ছায়ায় লোক চেনা যায় না মাঠ থেকে। গলার স্বরটা প্রায় বাবার মতো। বুকে ছলাৎ করে ওঠে, হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়, ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে মাথা। গোটা শরীরে নিমেষে গরম একটা ভাপ ছড়িয়ে গেল। চোখ জ্বালা করছে।

প্রচণ্ড গতির আউট-সুইঙ্গারটাকে পিছিয়ে খেলে আরউইন ব্যাটে পেল না। অফ স্ট্যাম্প ঘেঁষে গেল তরুণের হাতে। ৭৩ টেস্ট ম্যাচে প্রায় চারহাজার রান করা ও প্রায় তিনশো উইকেট পাওয়া আরউইন মাথা নামিয়ে বলের পিচের দিকে তাকিয়ে রইল। ক্লোজ ইন ফিল্ডাররা দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠেছিল। পরের বল একই ভঙ্গিতে ডেলিভারি করল অনন্ত। একই বল, একই জায়গায় পড়ল, কিন্তু মন্থর গতিতে। আরউইন

আগের বলের মতোই পিছিয়ে গেল। বলটা আগের বলের মতোই বেরিয়ে গেল, শুধু যাবার সময় ফেলে দিয়ে গেল অফ স্টাম্পের বেলটা। ফিরে যাবার সময় আরউইন মুখ ঘুরিয়ে অনন্তর দিকে তাকাল। তার চোয়ালের পেশী শক্ত হয়ে গেছে। ওভারের চতুর্থ এবং শেষ বলে বাকি উইকেট দুটোও সে পেল, তরুণের গ্লাভসে এবং বোল্ড করে। ছয় উইকেটে ৫১ রান।

ড্রেসিংরুমে তরুণ বলল, "আর ইনিংস ডিফিট দিতে পারবে না, ড্র হচ্ছে। সবাই ধরে খেললে কাল টি পর্যন্ত আমরা চালিয়ে যাব।"

১৯ রানে পিছিয়ে থেকে পূর্বাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামল চা-এর পর। অ্যামরোজ আর আরউইন দুটো ঘূর্ণি ঝড় হয়ে দেড়ঘণ্টায় পূর্বাঞ্চলকে ওলটপালট করে দিল। অনন্ত যখন ব্যাট করতে গেল তখন আরউইন একাই ৩১ রানে প্রথম পাঁচটা উইকেটই নিয়েছে। অ্যামরোজ আট ওভারে ১২ রান দিয়ে উইকেট পায়নি। ম্যাড্রফের দুই ওভারই মেডেন পেয়েছে।

প্রথম বলটাই বাউন্সার। অনন্ত হুক করল এবং ওভার বাউন্ডারি।

"ছক্কা···ছক্কা···উই ওয়ান্ট সিক্সার।" মাঠের একধারে শুরু হল, তারপর ছড়িয়ে পড়ল নামতা পড়ার সুরে—"উই ওয়ান্ট সিক্সার···উই ওয়ান্ট সিক্সার।"

গরম হয়ে উঠল অনন্তর মাথা। ওরা খুশি হবে, ওদের খুশি করে দেব। আরউইন তার ওপর রেগে আছে। আবার একটা বাউন্সার দেবে, দেবেই। অনন্ত তৈরি হল হুক করার জন্য। মন্থর, সোজা ফুলটস। ব্যাট চালাবার পর উইকেটে বল লাগার শব্দ শুনেই অনন্ত আর মুখ ঘুরিয়ে পিছনে তাকায়নি। কানে এল দুর্বোধ্য ভাষায় আরউইন কী যেন বলে হেসে উঠল। অনন্তর চোয়াল ধীরেধীরে শক্ত হয়ে উঠল ফিরে আসার সময়। এমন বেয়াকুফি জীবনে আর সে করবে না।

আট উইকেটে পূর্বাঞ্চলের ৭১ রান। অনন্ত গুম হয়ে গেল। মাঠে কোনও দিকে তাকাল না, কারও সঙ্গে কথা বলল না। শরীর গরম লাগছে। ঘরে এসেই শুয়ে পড়ল। মাথায় মধ্যে বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আরউইনের হাসিটা।

তৃতীয় দিনে পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে গেল ১০৩ রানে। অস্ট্রেলিয়ার ৮৫ রান দরকার ম্যাচ জিততে। তাদের হাতে দুশো রান তোলার মতো সময় রয়েছে।

ফিল্ড করতে নামছে পূর্বাঞ্চল। সবার শেষে অনন্ত। কানে এল একটা কথা : "বড় জোর কুড়ি ওভার। এখন তো ওয়ান ডে ম্যাচের মেজাজে ওরা ব্যাট করবে।"

ভ্রমরাকে দেখতে পেল। দু'হাত মুঠো করে ঝাঁকিয়ে ইশারায় লড়াই করতে বলছে। অস্ট্রেলিয়ার ছ'জন রেগুলার টেস্ট ব্যাটসম্যানের কাছে মাত্র ৮৫ রান তো একটিপ নস্যি ! কী লড়াই সে করবে ? তবু ভাল লাগল ভ্রমরার আগ্রহভরা উৎকণ্ঠা দেখে। অনন্ত হাসল এবং চোখ সরিয়ে নিতে গিয়েই তার পা থেমে গেল।

জীবন ! পাঞ্জাবির ডানহাতা গোটানো। নকল হাতটা যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। কনুইয়ের থেকে ইঞ্চি-পাঁচেক নীচেই হাতটা সরু হয়ে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে শক্ত একটা হাড়ের আভাস। জীবন তার দিকে তাকিয়ে।

পলকের জন্য অনন্ত চোখে অন্ধকার দেখল। চোখ থেকে মুছে গেল এই কিনান স্টেডিয়াম আর কয়েক হাজার দর্শক। টিম মাঠে নেমে গেছে। অনন্ত দৌড়ল।

তার প্রথম দুই ওভারে ২৪ রান নিল দুই ব্যাটসম্যান। আবোলতাবোল বল ফেলে পূর্বাঞ্চলকে সে একটু দ্রুতই পরাজয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। আর বল করতে না দিয়ে রাহুল আনল সতিন্দরকে। স্বচ্ছন্দে দুটো-তিনটে রান ওভারে উঠছে। নিস্তরঙ্গ সাগরে তরতরিয়ে চলেছে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের তরণী।

'অন্তু তোমার কি নিজেকে খারাপ লাগছে ?'

'হ্যাঁ বাবা। দু'ওভার বল করেই লং লেগ বাউণ্ডারিতে নির্বাসিত হলে, কোনও বোলারেরই নিজেকে ভাল লাগে না।'

'তা হলে নিজেকে যাতে ভাল লাগে তাই করছ না কেন ? বল নাও, চেষ্টা করো আউট করতে। তোমাকে তো বলেইছি সাফল্যের জন্য প্রচণ্ড খিদে থাকা দরকার। সফল হবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করো। যাও, আবার

চেষ্টা করো। মাথা ঠাণ্ডা রাখো। যাও অন্তু, যাও। তুমি পারবে। শেষ বল না হওয়া পর্যন্ত হার মেনো না। এখনও ওদের ছেচল্লিশ রান দরকার। ওদের এই রান তুলতে দিও না। অন্তু তোমাকে এইভাবে মাঠের কিনারে দর্শক হয়ে থাকতে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে। অন্তু কষ্ট হচ্ছে আমার···।"

"রাহুলদা।"

লং লেগ থেকে ছুটে আসছে অনন্ত। অধিনায়ক রাহুল শর্মা নিজে বল করবে বলে তখন ফিল্ড সাজাচ্ছে। সে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল পাগলের মতো ছুটে আসা অনন্তর দিকে।

"রাহুলদা, আমায় দিন বল। হেরে তো যাচ্ছিই, তবু একবার দুটো ওভার করতে দিন।"

অনন্ত জোড় হাতে মিনতি জানাল। কী ভেবে রাহুল বলল, "হ্যাঁ হেরে গেছিই···আচ্ছা করো তুমি।" ওভারের পঞ্চম বলে দ্বিতীয় স্লিপে বরুয়ার কাছে রজার্সের নিচু ক্যাচ গেল। বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে বলটা মুঠোয় নিতে না পেরে সে ধাক্কা দিয়ে তুলে দিল। প্রথম স্লিপে রাহুল লুফে নিল। ওভারের ষষ্ঠ বল, প্রচণ্ড গতির ইয়র্কার আরউইনের মিডল স্টাম্পের গোড়ায় বিস্ফোরিত হল। নিয়মরক্ষার তালি বাজল স্টেডিয়ামে। আরউইন মাথা নামিয়ে ফিরে গেল।

নিরঞ্জন তিন রান দিল পরের ওভারে।

আবার অনন্ত। বোলানকে ঘিরে আটজন ফিল্ডার। অনন্ত উইকেট পেলে হ্যাট্রিক হবে। এইবার নিজেকে নিংড়ে সর্বশক্তি দিয়ে একটা সোজা বল। নিছক গতিতেই বোলানকে হারাতে হবে। অনন্ত ভাবতে ভাবতে বোলিং মার্কে ফিরছে।

'অন্তু মাথা ঠাণ্ডা রাখো। জোরে বল দিতে গিয়ে স্টোকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করো না। বোলান ঝানু ব্যাটসম্যান। বুদ্ধি খাটাও।'

বলটাকে যখন বুঝল অনন্তর স্বাভাবিক গতির থেকে অনেক কম এবং অফ স্টাম্পের বাইরে, বোলান পিছনের পা থেকে শরীরের ভর সামনের পায়ে এনে, সামান্য ঝুঁকে ডিফেন্সিভ ব্যাট ধরল। ছোট্ট অফ কাটারটা ব্যাট আর প্যাডের ফাঁক দিয়ে পথ বার করে নিল।

প্রথমে লাফিয়ে উঠল তরুণ। উন্মত্তের মতো সে ছুটে গিয়ে অনন্তকে

জড়িয়ে মাটি থেকে তুলে নিল।

"হ্যাটট্রিক, হ্যাটট্রিক...আমরা জিতব। আমার মন বলছে জিতব।"

আকাশ ভাঙা চিৎকার তখন স্টেডিয়ামে। সবাই তাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। অনন্তর চোখে বোবা চাহনি। কিছুই তার চেতনায় ছাপ ফেলছে না।

বোলানেরই নির্দেশে বোধহয়, অনন্তকে পিটিয়ে ছত্রাকার করে দেবার জন্য পরের ব্যাটসম্যান ব্যাট চালিয়ে ফেলল। পরপর দুটো বাউণ্ডারি নিল মিড উইকেট থেকে। চতুর্থ বলেও হাঁকড়াল। ব্যাটের কিনারে লেগে বলটা উঁচু হয়ে উঠল মিড অফে। ওখানে লোক নেই। অবিশ্বাস্যভাবে ফলো থ্রু থেকে দেহ ঘুরিয়ে নিয়ে অনন্ত ক্যাচ নিতে দৌড়ল। বল জমিতে পড়ার তিন-চার ইঞ্চি আগে সে ঝাঁপিয়ে ডান হাতে ধরে নিল।

"বাবা আমি চেষ্টা করছি।" বলটা আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে অনন্ত মনে মনে বলল।

এই ওভারের শেষ বল। জোরে ফরোয়ার্ড পুশ করেছে ব্যাটসম্যান। অনন্তর পাশ দিয়ে বলটা গেল। ফিল্ডার নেই। অনন্তই দৌড়ল। কভারে একজনই ফিল্ডার সেও দৌড়ল।

ওরা এক রান নিল। দ্বিতীয় রানের জন্য দৌড়বে কি না, ইতস্তত করল বোলার প্রান্তের ব্যাটসম্যানটি। দোনোমনো করে অবশেষে বেরোল। তখন অনন্ত বল তুলে নিয়েছে। প্রায় ৪৫ গজ থেকে তার ছোঁড়া বল উইকেটকিপারের হাতে যখন পৌঁছল, ব্যাটসম্যানটির তখনও দু'গজ বাকি ক্রিজে পৌঁছতে।

স্টেডিয়াম প্রায় দু'মিনিট ধরে উল্লাস উদ্গীরণ করেই হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। একটা অবিশ্বাস্য, অপ্রত্যাশিতের আভাস যেন ভেসে এসেছে মাঠে। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। প্রতিটি মানুষ এখন শুনতে পাচ্ছে নিজের বুকের ধকধকানি। অস্ট্রেলিয়ার ৩৪ রান দরকার, হাতে পাঁচ উইকেট।

নিরঞ্জনের ওভার। দুটো স্ট্রোক থেকে একটা চার, একটা তিন রান হল।

আবার অনন্ত। পরপর তিনটে বল ট্রিমার, উইকেট ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। চতুর্থটা ব্যাটের কানায় লেগে স্লিপের মধ্য দিয়ে এক রান। রাহুল

আক্রমণাত্মক ফিল্ড সাজিয়েছে। থার্ডম্যান বাউণ্ডারিতে লোক রাখেনি। দ্বিতীয় স্লিপ থেকে বরুয়া ছুটে গিয়ে বাউণ্ডারি লাইনে বল থামাল। তিনরান। পরের দুটো বল আটকে দিল ব্যাটসম্যান।

নিরঞ্জনের ওভার। দুই ব্যাটসসম্যানই স্থির করে ফেলেছে, অনন্তকে সামাল দিয়ে অন্য বোলারের কাছ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জয়ের জন্য রান তুলবে। ভাল লেংথ আর ডিরেকশন রেখে নিরঞ্জন বল করছে। ব্যাটসম্যান রান করার সুযোগ পাচ্ছে না, তাই অধৈর্য হয়েই গুড লেংথ বল ফ্লিক করতে গিয়ে ফসকাল। এল বি ডবলু আবেদন জানাল আটজন ফিল্ডার। আম্পায়ার আঙুল তুললেন। ব্যাটসম্যান খুবই অবাক হবার ভান করে ব্যাট তুলে বোঝাতে চাইল, বলটা প্রথমে সে ব্যাটে খেলেছে। কিন্তু আম্পায়ার অটল রইলেন তাঁর সিদ্ধান্তে। এইসব অভিনয় দেখায় তিনি অভ্যস্ত।

আর ২৪ রান, রয়েছে চারটে উইকেট। কী একটা ত্রাস এবার অস্ট্রেলীয়দের কলিজাকে চেপে ধরেছে, যারফলে পরের ব্যাটসম্যানরা ধৈর্য এবং বিচারবোধ হারিয়ে ফেলল। অনন্ত এখন তাদের কাছে যমদূত। তার প্রতিটি বল এখন মৃত্যুর শমন। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং সর চেঁছে তুলে নিয়েছে পূর্বাঞ্চল, এখন শুধু পড়ে আছে তলানি। উত্তেজনায় স্টেডিয়াম এখন দুলছে।

খেলা আচমকাই শেষ হয়ে গেল। আট নম্বরে গোন্ডি নেমেছে। অনন্তর পরের ওভারে সে লং-অনে দুটো ওভার বাউন্ডারি মেরে বারোরান তুলতেই রাহুল সেখানে একজনকে পাঠাল। এগিয়ে গিয়ে অনন্তকে বলল, "ইয়র্কার দাও, বোল আ স্লোয়ার ওয়ান।"

অনন্ত ঠিক তাই দিল। ইয়র্কারটা গোন্ডির দুটো স্টাম্প শুইয়ে, হঠাৎ মন্থর বলে লেভিনকে মিড-অনে ক্যাচ তুলিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে জয়-পরাজয়ের মধ্যবিন্দুতে এনে দিল। দশ নম্বরে এল লেসলি এবং ওভারের শেষ বলে পরিষ্কার বোল্ড হল বলের গতিতে। শেষ উইকেট এবং বারো রান বাকি।

এই সময় স্নায়ু ঠিক রেখে অবিচল থেকে বল করা আর ব্যাট করা, দুটোই কঠিন। ফেলপস আর নিরঞ্জন। স্নায়ুযুদ্ধে কে জেতে? গ্যালারি ও

প্যাভিলিয়নে অনেকের স্নায়ুই ছিঁড়ে গেছে। মুখ নামিয়ে মাঠ থেকে অনেকেই চোখ সরিয়ে রেখেছে, উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছে। বিরাজ করছে নৈঃশব্দ্য।

নিরঞ্জনই জিতল। ফেলপস শুধু দুটি রান নিতে পেরেছে। ডিপ মিড উইকেট থেকে। দশ রান বাকি। এবার পরের ওভার।

'অন্তু আকাশে প্রাসাদ তুমি বানিয়েছ। এই ম্যাচ থেকেই তুমি টেস্ট ম্যাচে পা রাখবে। যে স্বপ্ন দেখে আসছ, এবার তা সফল হতে চলেছে। প্রাসাদটা আকাশ থেকে পড়ে যাবে, যদি না ওর তলায় ভিত তৈরি করে দাও। অন্তু যাও, ওই উইকেটটা নিলেই ভিয তৈরি হয়ে যাবে, যাও।'

বলটাকে বুকের কাছে দেখেই ম্যাড্রফ ব্যাট তুলে ঠেকাল। ব্যাট থেকে বলটা আলতোভাবে উঁচু হয়ে অনন্তর বুকের কাছে নেমে এল। বাকি কাজটায় সে ত্রুটি রাখেনি। অস্ট্রেলিয়া নয় রানে হারল।

॥ দশ ॥

দিল্লিতে প্রথম টেস্ট-ম্যাচে প্রথম দিনের খেলা হওয়ার পর অনন্তদের বাড়িতে জীবন এসেছিল। আনন্দবাজারে প্রকাশিত স্টাফ রিপোর্টারের লেখাটা নিয়ে কথা প্রসঙ্গে অনন্ত বলেছিল, "মনে হয় বোর্ড কিছু একটা করবে।"

জীবন বলেছিল, "আজ ইন্ডিয়া টিমের যা পারফরমেন্স, তাতে প্লেয়ারদের গায়ে হাত দিতে বোর্ড সাহস পাবে না। না হারলে কোনও অ্যাকশনই নিতে পারবে না। হয়তো সময়ের অপেক্ষায় বোর্ড রয়েছে। আর সেই সময়টা বোধহয় ঘনিয়ে আসছে।"

দিল্লি এবং কানপুরে হারার পর ঘনিয়ে এল সেই সময়। হায়দরাবাদ আর জামশেদপুরের খেলার ফল বোর্ডকে সাহসী করে তুলল। দেশজুড়ে সাধারণ লোকের ধিক্কার আর খবরের কাগজের সমালোচনা ক্রমশ ছড়িয়ে গিয়ে বোর্ডকেই চাপের মধ্যে ফেলল, এখনই একটা ব্যবস্থা নেবার জন্য। এই চাপটাই বোর্ড-প্রেসিডেন্ট চাইছিলেন।

কলকাতায় তৃতীয় টেস্ট-ম্যাচের দিন সকালে ড্রেসিং-রুমে অধিনায়ক মকরন্দ ভার্দেকে চিঠি দিয়ে জানানো হল, বোর্ডের কার্যকরী সমিতি বিশেষ

সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভারতীয় দলের কোনও সদস্যই খবরের কাগজে এই সিরিজ চলাকালে লিখতে পারবে না।

চিঠি পড়েই ভার্দে রাগে ফেটে পড়েছিল। ইন্টারন্যাশনাল ফিচার্সের সঙ্গে তার চুক্তি, প্রতিদিনের খেলা সম্পর্কে লেখার জন্য পাঁচ হাজার টাকা পাবে। একটা টেস্ট-ম্যাচে পঁচিশ হাজার টাকা। এত টাকা তাকে ছাড়তে হবে ?

"খেলার পর প্রেস-কনফারেন্সে কি আমাকে ক্রিকেটে অজ্ঞ, নির্বোধ জার্নালিস্টদের প্রশ্নের জবাব দিতে হবে এবার থেকে ? আমি এক হাজার কথা বলে একটা সূক্ষ্ম ব্যাপার ব্যাখ্যা করে বলব, আর ওরা সেটা দশ লাইন লিখবে, কেউ-কেউ তাও লিখবে না, কেউ-কেউ উলটো জিনিসই লিখে বসবে। পঞ্চাশটা কাগজে ভুল জিনিস বেরনোর থেকে, দেশের সাত-আটটা কাগজে আমার কলাম বেরোলে তাতে আরও বেশি কাজের কাজ হবে। বোলান যেসব কথাবার্তা বলে আম্পায়ারদের উপর, ইন্ডিয়ান বোর্ডের উপর প্রেসার তৈরি করছে, মাঠে যেভাবে আজেবাজে অ্যাপিল করছে, দাবি জানিয়ে তেড়ে যাচ্ছে আম্পায়ারদের দিকে, এসব কথা তো দেশের লোককে জানাতে হবে। ওদের মিথ্যের মুখোশ খুলে না দিলে প্রেসার তো আমাদের উপরই পড়বে।"

কথাগুলো সে বলেছিল কয়েকজন সাংবাদিকের সামনে। তারাও ঘস্‌ঘস্‌ করে সব টুকে নেয়। তাদেরই একজন ভার্দের কথাগুলো বোর্ড-সচিব হরিহরণের কাছে তুলতেই তিনি বললেন, "কথাগুলো তো ভালই। কিন্তু দেখুন, টেস্ট-ম্যাচের মতো উচ্চ পর্যায়ের ক্রিকেটে যারা পৌঁছেছে তারা কেউই ছেলেমানুষ নয়, প্রত্যেকেই পরিণত বোধবুদ্ধিসম্পন্ন। খবরের কাগজে লেখা পড়েই তারা প্রভাবিত হয় না। কিন্তু এসব কথা ছাড়াও বলছি, ন্যাশনাল প্রেস ভার্দের বক্তব্য যদি বাদছাদ দেয়ও বা মূল পয়েন্ট বুঝতে না পারে, তা হলে সে লিখিত বিবৃতি দিক। সি এ বি বলেছে, আমরা স্টেনোগ্রাফার দিচ্ছি, ভার্দে ডিক্‌টেশন দিক। সেটা টাইপ করে, জেরক্স করে সাংবাদিকদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হবে। সারা দেশকে জানাতে মাত্র কয়েকটা কাগজে কলাম লেখার থেকে, এটাই কি ভাল পন্থা নয় ? তা ছাড়া অধিনায়ক হয়ে সে কি নিজের

খেলোয়াড়দের যথার্থ সমালোচনা করতে পারবে ? যদি করে তা হলে সেটা অনৈতিক হবে, আর তাতে টিমের মধ্যে ক্ষোভও তৈরি হবে। যদি না করে তা হলে লেখার কী দরকার ?"

ভার্দে বলল, বোর্ডের নির্দেশ তার পক্ষে মানা সম্ভব নয়।

দলের চারজন ক্রিকেটার চারটি কাগজের সঙ্গে মৌখিক চুক্তি করেছে। প্রতিদিনের খেলার উপর তারা বলবে, কেননা তারা লিখতে পারে না। সেটাই তাদের নামে বেরোবে। এ জন্য প্রতিদিন খেলোয়াড়দের জনপ্রিয়তা অনুযায়ী পাঁচশো থেকে দু'হাজার টাকা তারা পাবে। এরাও ভার্দেকে সমর্থন জানিয়ে খবরের কাগজে মন্তব্য করল। একটা থমথমে আবহাওয়া খেলার আগে ভারতীয় ড্রেসিং-রুমে তৈরি হয়ে গেল। তার মধ্য থেকে বেরিয়ে মাঠে গিয়ে টস করল ভার্দে এবং বোলানকে হারিয়ে ব্যাটিং-সিদ্ধান্ত নিল।

প্রথম বলেই মাঠের ৮৫ হাজার দর্শক চমকে গেলেন। লটনের বিরাট আউট সুইঙ্গারে হেলাফেলা করে গ্লান্স করতে গিয়ে পিল্লাই উইকেটকিপারকে ক্যাচ দিয়ে ফিরে এল। তারপর ভার্দে, উসমানি, নবরকেও লটন আর ব্রাইট ফেরত পাঠাল। লাঞ্চে চার উইকেটে ৪৫। তারপর ৬৩—৬। কাপুর এসে শত্রু-শিবিরে ঠেলে নিয়ে গেল যুদ্ধটা। ব্রাইটের দুই ওভারে সে ২৪ রান নিল। ৮৫ বলে সে ৪৪ করল, আটটা চার মেরে। গুপ্তা করল ৬৯, বেঙ্গটরঙ্গন ৪৯। দিনের শেষে ভারতের আট উইকেটে ২৩১।

খেলা ভাঙার প্রায় এক ঘণ্টা পর জীবনের গাড়িতে অনন্ত ফিরছিল। খেলা নিয়ে তাদের মধ্যে কথাবার্তা হতে-হতে জীবন বলল, "তোকে দ্বিতীয় টেস্টের পর বলেছিলাম, ওরা কোনও টেস্টই এই সিরিজে জিততে পারবে না। কথাটা মিলিয়ে নিস। গোটা টিমটাই মেন্টালি ডিস্টার্বড, টিম স্পিরিট বলে কোনও জিনিসই নেই। কী করে দুটো পয়সা হাতানো যায় শুধুই সেই ধান্দায় ব্যস্ত। একেবারে ভিখিরি ক্লাসের। নারানদা জানালেন, "রেস্ট ডে-তে সি এ বি প্রেসিডেন্টের ঘরে বোর্ডের কর্তারা বসবে।"

"ও তো হামেশাই বসে।"

"এবার বসবে বাঙ্গালোরে ফোর্থ টেস্টের জন্য নামের লিস্ট নিয়ে।

ফিফ্‌থ ডে টি-এর সময়ই টিমের নাম ঘোষণা করবে।"

"ওরা লিস্ট নিয়ে বসবে মানে ?" অনন্ত অবাক কৌতূহলে তাকাল। "ওরা কি সিলেক্টর ?"

"সিলেক্টরদের বাবা ওরা। সিলেকশন মিটিং একটা হবে বটে, তাতে ওদের দেওয়া লিস্ট নিয়েই সিলেক্টাররা আলোচনার মহড়া দেবে।" জীবন আড়চোখে অনন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপরই কথা ঘুরিয়ে দিতে বলল, "কাকিমাকে বলিস তো, অনেকদিন ওঁর হাতের আলুর দম খাইনি। কাল নিয়ে আসবি।"

"তুই কালও কষা মাংস আনবি ?"

"কাল নিরামিষ। আবার পরশু আমিষ। তোদের ওখানে সেই দোকানটার কাঁচাগোল্লা পাস কিনা দেখিস তো।"

খেলার দ্বিতীয় দিনে ভারতের ইনিংস আর মাত্র দশ রান তুলেই ২৪১ রানে শেষ হয়ে গেল। তার আগে টেস্ট ক্রিকেটে ব্রাইটের দুশো উইকেট পূর্ণ হয়। এটা তার ৪৬-তম ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়ার ৩২ রানে কাপুর এল বি ডবলু করল রজার্সকে। বোলানকে অসাধারণ আউট সুইঙ্গারে ক্যাচ তোলাল উইকেটের পিছনে। গুপ্তা প্রথম স্লিপের সামনে ঝাঁপিয়ে ধরল। দুয়া আর ফরজন্দ একটি করে এবং দ্বিতীয় স্পেলে কাপুর আবার অস্ট্রেলিয়াকে ধাক্কা দিল। শর্ট ফাইন লেগে আরউইনের ক্যাচ তার বলে ধরল উসমানি। মাত্র ১৭ বলের ব্যবধানে কাপুর এক রান ব্যয় করে তিনজনকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া পাঁচ উইকেটে ৮৮। ভারত প্রত্যাঘাত করেছে। গতকাল ভারতেরও ঠিক এই অবস্থা হয়েছিল।

ইডেনে ৮০-৯০ হাজার লোক উদ্দীপ্ত হয়ে এবার গলা খুলেছে। বিশাল গামলার মতো স্টেডিয়ামে সেই আওয়াজ সহ্য করে মাথা ঠিক রাখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। অবশিষ্ট একমাত্র স্বীকৃত ব্যাটসম্যান মিন্টার কিন্তু সেই কঠিন কাজটা মাথা ঠিক রেখে করে যেতে লাগল। তাকে সাহায্য দিল লটন। দিনের শেষ ওভারে ধারাদ্ধারের বলে লটন এল বি ডবলু হল ৫৪ রান করে। সিরিজে এটা তার দ্বিতীয় পঞ্চাশ।

ভার্দে তার সীমিত বোলিং পুঁজি নিয়ে লটনকে বেঁধে ফেলায় ব্যর্থ হল। দু'ঘণ্টায় সে ৮৭ রান জুড়ে দিল ষষ্ঠ উইকেটে। ম্যাচ এখানেই ঘুরে গেল।

মিন্টার ক্রিজে ৫৫ রান নিয়ে রয়ে গেল ধৈর্যের প্রতীক হয়ে। দ্বিতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার ছয় উইকেটে ১৭৯ রান। যুদ্ধরেখা এখন পরিষ্কারভাবে টানা হয়ে গেছে।

তৃতীয় দিনে ভারতের বিপর্যয় নেমে এল। স্পিনাররা বল করতে লাগল উদ্ভাবনীক্ষমতা ও কল্পনাশক্তি ড্রেসিং রুমে রেখে এসে। গা-ছাড়া ফিল্ডিং। ম্যাচটা ক্রমশ ভারতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল।

দুটি উইকেট ২১৩ রানের মাথায় হারালেও মিন্টার টেস্ট ম্যাচে তার দশম সেঞ্চুরিটি সংগ্রহ করল। প্রায় পাঁচশো মিনিট ব্যাট করে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত রয়ে গেল ১৭০ রানে। আর ব্রাইট তার প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ৬৮ রান করে গেল। নবম উইকেটে সে আর মিন্টার ১৬১ রান তুলল। ২১৩-৮ যখন, ব্রাইট ক্রিজে আসে। ভারত তখনই অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ করার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু ব্রাইটের ব্যাটিংক্ষমতা বা মানসিক কাঠিন্যকে হিসেবে রাখেনি। বিস্ময়করভাবে পুনরুদ্ধার করা অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস ৩৮১ রানে শেষ হল। কাপুর ৯১ রান দিয়ে চারটি উইকেট পেল ৩৫ ওভার বল করে। ধারাদ্ধার ৮০ রানে তিনটি।

১৪, ২৯, ২৯, ৩৩—ভারতের প্রথম চারজন দ্বিতীয় ইনিংসের এই রানের মাথায় ফিরে এল। ধ্বংসটা শুরু করেছে অ্যামরোজ। তিনজন নিছক গতিতেই বোল্ড হয়েছে। পিল্লাইয়ের এলোপাথাড়ি ব্যাট থেকে ২০ রান এসেছে। পুষ্করনা ম্যাচে দ্বিতীয়বার শূন্য করে 'চশমা' পরল। তৃতীয় দিনের শেষে ভারতের অবস্থা চার উইকেটে ৩৬। ম্যাচ এবং সিরিজও অস্ট্রেলিয়া গুটিয়ে ফেলেছে, এখন তা বলা যায়। তারা ১০৪ রানে এগিয়ে পুরো দ্বিতীয় ইনিংস হাতে নিয়ে। ভারতের সম্বল শুধু ছয়টি উইকেট।

প্রতিটি কাগজেই এই ধারণাটাই ম্যাচ রিপোর্টে বলা হল, খেলা চতুর্থ দিনেই শেষ হবে, যদি না ভূমিকম্প হয়, গঙ্গায় বান এসে চৌরঙ্গি পর্যন্ত ভাসিয়ে দেয়, কিংবা আমেরিকা বা রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষায় কোনও হিসেবের ভুলে একটা যদি পথ হারিয়ে ইডেনে চলে আসে!

॥ এগারো ॥

তনিমার জ্বর-জ্বর মতো হয়েছে। ম্যাচের বিরতি-দিনে অনন্ত বাড়ি থেকে বেরোল না। দুপুর গড়াতেই সে বাইরের চাতালে এসে বেতের চেয়ারে বসে একটা টুলে পা তুলে দিয়ে 'মহাস্থবির জাতক' উপন্যাসটা পড়ায় মগ্ন হয়ে গেছল। পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে হুঁশ ছিল না।

একসময় ফুলি এসে টুলে উঠে তার পায়ে মাথা ঘষতে শুরু করায়, সে বার দুই "উঁ উঁ, কী হচ্ছে, সুড়সুড়ি লাগছে, এখন আদর করতে পারব না...যাও, ডিস্টার্ব কোরো না।" বলল, তারপর বই বন্ধ করে ফুলিকে কোলে তুলে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে সামনে ঝুঁকেই সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বন্ধ গেটের সামনেই একটা সাইকেল রিকশায় বসে ভ্রমরা!

তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে পা লেগে টুলটা এবং ফুলি পড়ে গেল। সে দৌড়ে গেল গেটের দিকে।

"আপনি যে কত বিখ্যাত লোক আজ তার প্রমাণ পেলাম। সেই দমদম রোডে যেই বলেছি অনন্ত সেনের বাড়িটা...অমনি সাত-আটজন বলে উঠল, এই তো এই তো সোজা গিয়ে মিষ্টির দোকানের বাঁ দিকে, তারপর টিউবওয়েলের ডান দিকে, তারপর দুটো মোড়, শিবমন্দির ঘুরে...উফ্‌ফ। আচ্ছা, কতদূর পর্যন্ত আপনি বিখ্যাত?"

"দমদম ইস্টিশনে যে-কোনও রিকশাওয়ালাকে ওঁর নাম বলবেন, আপনাকে ওঁর বাড়ি পৌঁছে দেবে।" মাঝবয়সী রিকশাওয়ালার গলায় প্রচ্ছন্ন গর্ব ফুটে উঠল।

"ভেতরে আসুন।" বিস্ময় ভেদ করে কোনওক্রমে অনন্তর মুখ থেকে দুটি শব্দ বেরোল।

"টেস্ট-ম্যাচ চলছে, এখন বাড়িতে থাকবেন কি থাকবেন না, এই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম। ...কী অবস্থা হয়েছে বলুন তো ইন্ডিয়া টিমের!"

"হ্যাঁ, কেমন যেন একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে।"

চাতাল পেরিয়ে বাড়ির মধ্যে তারা ঢুকল। দালানে অরুণ সেনের ছবিটায় চোখ পড়তেই ভ্রমরা দাঁড়িয়ে গেল।

"আমার বাবা।"

ভ্রমরা নমস্কার করে বলল, "দেখেই বুঝেছি। বাবা ওঁর চওড়া কপালের কথা বলেছিলেন।"

"মা'র জ্বর হয়েছে, ঘরে শুয়ে আছে।"

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে অনন্ত বলল, "মা, এই দ্যাখো কে এসেছে।"

তনিমা হাতের বইটা মুড়ে পাশ ফিরে তাকিয়েই উঠে বসলেন।

"জামশেদপুরে এদের বাড়িতেই আমি গেছলাম। এ হল ভ্রমরা।"

তনিমা উঠে বসতেই ভ্রমরা প্রণাম করল।

"বোসো মা, ...তোমাদের সবার কথাই অন্তুর কাছে শুনেছি। তোমার বাবাকে আমি অবশ্য দেখিনি, তবে ওঁর মুখে শুনেছি। তোমার নাম কে রেখেছেন? শুনেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকাদের কথা মনে পড়ে যায়।"

"দাদামশাই রেখেছেন, তবে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমর, আর আমি ভ্রমরা। আমার মায়ের নাম মৃণাল।"

"অন্তু, চায়ের কথা পিসিকে বল।"

"শুধু চা কিন্তু। না না, সৌজন্য-টৌজন্য নয়, দু'ঘণ্টা আগে সেজোমাসির বাড়িতে ভাত খেয়েছি। উনি ডাক্তার, এই স্টেশনের কাছে ওঁর নার্সিংহোম। মনে হল, কাছাকাছিই যখন এসেছি তখন খোঁজ করে দেখি।"

"খুব কি খোঁজাখুঁজি করতে হল? আমাদের বাড়িটা যখন কেনা হয় তখন জায়গাটা খুব নির্জন, ফাঁকা-ফাঁকা ছিল। গত দু'বছরে কী অসম্ভব রেটে যে বাড়ি উঠে গেল!"

ওরা বাইরে এসে বসলেন। চা খেতে-খেতে নানান কথা হতে লাগল। তনিমা একসময় জিজ্ঞেস করলেন, "লেখাপড়া শিখে তারপর কী করবে?"

"ব্যবসা।"

একই সঙ্গে মা ও ছেলের ভ্রূ উঠে গেল কপালের দিকে।

"কীরকম ব্যবসা, শাড়ির? আজকাল তো দেখি শিক্ষিত সম্পন্ন বাড়ির বউয়েরা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তাঁতের শাড়ি বিক্রি করছেন। ভালই এটা।"

তনিমা তারপর যোগ করলেন, "আমিও তো টিউশনি করি। একই ব্যাপার।"

"আমি ভাবছি বিজ্ঞাপনের একটা কাগজ করব। প্রথমে চার পাতার। বালিগঞ্জ, গড়িয়াহাট, কালীঘাট, ভবানীপুর ওই সব অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন থাকবে। আর কাগজটা বিনি পয়সায়, ধরুন প্রথমে পাঁচ হাজার ওই সব অঞ্চলেরই বাড়িতে বিলি করব। বিজ্ঞাপন ছাড়াও তাতে থাকবে ওই অঞ্চলের নানা ঘটনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের, নানান স্কুলের আর স্থানীয় নামকরা লোকদের সম্পর্কে খবরাখবর।"

"বিনি পয়সায়! তা হলে খরচ উঠবে কী করে?" অনন্ত অবাক হয়ে জানতে চাইল। সে বুঝতে পারছে না এভাবে ব্যবসা করা সম্ভব কি না, তাও একটি মেয়ের পক্ষে!

"ওই অঞ্চলে কত গহনার, জামা-কাপড়ের, জুতোর, ওষুধের দোকান, খাবারের দোকান, রেস্তোরাঁ, ডাক্তার, উকিল, নার্সিংহোম, বিউটি পার্লার, রিপেয়ারিং শপ, বাসনকোসনের দোকান আছে জানেন? তারাই বিজ্ঞাপন দেবে। সেই টাকাতেই এই ফ্রি-শিটার বা অ্যাডভার্টাইজার চলবে। আমেরিকায় এরকম কাগজ আছে। দিল্লিতেও একজন মহিলা করেছেন, আট পাতার কাগজ, দশ হাজার বিলি করেন। লাভও করছেন, কেননা বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপন দিয়ে ভাল রেসপন্স পেয়েছে। দিল্লির মতো কলকাতাতেও এখন বিরাট কনজিউমার সোসাইটি গড়ে উঠছে। লোকে কেনাকাটা বাড়াচ্ছে। তাই তো ভেবেচিন্তে আমরা তিন বন্ধু মিলে ঠিক করেছি এইরকম একটা উদ্যোগে নামব। আর নেমে না পড়লে ব্যাপারটা তো ঠিক বোঝা যাবে না।"

"খুব খাটতে হবে তোমাদের।" তনিমা আর হালকাভাবে মেয়েটিকে দেখছেন না। ওর মধ্যে বুদ্ধি, কল্পনা আর সাহস দেখতে পেয়ে তিনি সমীহও করতে শুরু করেছেন। যথেষ্ট সম্পন্ন লোকের মেয়ে, ভাল পাত্রের সঙ্গে বিয়ে তো হতেই পারে, লেখাপড়াতেও নিশ্চয় ভাল আর সুন্দরী না হলেও সুশ্রী। সংসার নিয়ে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু নিশ্চিন্ত আরামের বদলে লড়াই করতে তৈরি হচ্ছে। তনিমার মনে হল, মেয়েটি প্রকৃতই আধুনিক।

"খাটতে তো হবেই। না খাটলে কি এসব জিনিস দাঁড়াতে পারে?" ভ্রমরা এমনভাবে বলল যেন সূর্য উঠলে রোদ তো হবেই ধরনের স্বতঃসিদ্ধ কথা। "পাঁচ-ছ'ঘণ্টা রোজ ঘুরতে হবে আমাদের, হয়তো তারও বেশি।"

"তোমার বাবা-মা কী বলছেন?"

"বাবা তো শুনেই লাফিয়ে উঠেছেন।"

"অন্তুর বাবাও তাই করতেন। আমারও শুনে খুব ভাল লাগছে। উপায় থাকলে বলতাম আমাকে পার্টনার করে নাও।"

"আগে শুরু তো করি।" বলতে-বলতেই ভ্রমরা পা দুটো চেয়ারে তুলে "হুসস, ভাগ্ ভাগ্," বলে উঠল।

ফুলি এসে ওর পায়ে মাথা ঘষেছিল। বেড়ালে ভ্রমরার অরুচি। অনন্ত কোলে তুলে নিল ফুলিকে। কথাবার্তা এরপর অবধারিতভাবেই টেস্ট-ম্যাচে এসে গেল।

"আপনি খেলা দেখতে গেছলেন নাকি!" অনন্ত জিজ্ঞেস করল।

"না। বসে-বসে অতক্ষণ টিভি দেখাও পোষায় না। তবে এটুকু জানি, কালই আমরা হারছি।"

তনিমা ফিকে হেসে বললেন, "যদি তোমার মতো হত, তা হলে বোধহয় এই অবস্থায় পড়ত না।"

"আমার মতো নয়, ওঁর মতো যদি হত।" ভ্রমরা তাকাল অনন্তর দিকে। অনন্তর কান দুটো গরম হয়ে উঠল।

"কাকিমা, আপনি যদি সেদিন মাঠে থাকতেন তো বুঝতেন। কী প্রচণ্ড যে একটা ব্যাপার উনি করলেন। হাসতে হাসতে অস্ট্রেলিয়া যে ম্যাচটা জেতে, সেটা কীভাবে যে ছিনিয়ে আনলেন, ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।"

তনিমা স্নিগ্ধ চোখে ছেলের দিকে তাকালেন। অনন্ত আমতা-আমতা করে কিছু একটা বলল, যেটা ফুলি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারল না। অনন্তর কোলে বসে চোখ বুজে সে ঘড়ঘড় শব্দ শুরু করল।

"মানুষকে খুব ইন্সপায়ার করে এইরকম পারফরমেন্স। কতদূর পর্যন্ত যে মানুষের ইচ্ছে আর ক্ষমতা যেতে পারে, এইসব ব্যাপার থেকে তা বোঝা যায়। তাই না কাকিমা?"

"অন্তু এসে বলেছিল, তুমি অনেকটা ওর বাবার মতো কথা বলো, এখন দেখছি ঠিকই বলেছে।"

"তাই বুঝি!" ভ্রমরা হাসল।

"উনি বলতেন স্বপ্ন না দেখলে বড় হওয়া যায় না। এখনকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বপ্ন দেখার সাহসটা আগের থেকে বেড়েছে। এরা বুঝেছে স্বপ্নটাকে ধরার জন্য তাড়া করতে হবে, সেজন্য ধৈর্য আর পরিশ্রম দরকার। অন্তু পরিশ্রম করে, ইচ্ছেটাও আছে। যদি মানুষকে ইন্সপায়ার করতে পারে, তা হলে জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও পাবে।"

"কিন্তু মা, ওর এই ব্যবসায় নামার কথায় আমিও কিন্তু ইন্সপায়ার্ড হচ্ছি।"

"ব্যবসা শুরু করবেন নাকি?"

"না, না, বোলিং। যার যা কাজ।"

সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। ভ্রমরাকে অনেক দূরে যেতে হবে। সে বিদায় নিল। তাকে এগিয়ে দিতে অনন্ত তার সঙ্গ নিল।

চলতে চলতে ভ্রমরা বলল, "আমাদের কাগজটার জন্য অনেকের অনেকরকম সাহায্য দরকার হবে, আপনার সাহায্যও চাইব।"

"আমার! কীভাবে করতে পারি?"

"নাম দিয়ে। আপনি যদি আমাদের জন্য কয়েকটা জায়গায় পার্সোনালি বলেন, তা হলে কেউ ফেরাতে পারবে না।"

অনন্ত সশব্দে হেসে উঠল। "সেরকম নাম এখনও হয়নি। টেস্ট-লেভেলে নাম করতে হবে, তবেই লোকে খাতির করবে। আর আমি তো এখনও টেস্টেই খেললাম না।"

"খেলবেন।"

"কী করে জানলেন?"

"আমার মন বলছে।"

বাসে তুলে দেওয়া পর্যন্ত অনন্ত আর একটাও কথা বলেনি। বাস ছাড়ার সময় সে হাত তুলে হঠাৎই বলে, "আমি খেলব।"

॥ বারো ॥

চতুর্থ দিন শুধু উসমানিই কিছু লড়াই করল। সে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত রইল ৩০ রান করে। লটন ৩৭ রান দিয়ে ছ'টি উইকেট পেয়েছে। ভারতের ইনিংস শেষ হয়েছে ৯৪ রানে। ইনিংস আর ৪৬ রানে অস্ট্রেলিয়া জিতল।

ক্লাব-হাউসের দু'ধারের স্ট্যান্ড থেকে ধিক্কার, গালিগালাজ আর তার সঙ্গে উড়ে আসছে কাগজের কাপ ও গ্লাস, কমলা লেবুর আর কলার খোসা। কয়েকটা ইটও এসে পড়ল। গ্যালারির নানান জায়গা থেকে আগুনের শিখা জ্বলে উঠল। হাজার-হাজার মুখ ক্রোধে বিকৃত। পরাজয়ের থেকেও বেশি লজ্জা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণের জন্য। ভারতের ড্রেসিং-রুমের দরজা বন্ধ। বোলান হাসিমুখে দল নিয়ে মাঠ থেকে ফিরল। ভারতের শেষ দুই ব্যাটসম্যানের মাথায় থুথু পড়ল। ক্লাব-হাউসের সামনের রাস্তায় মারমুখো জনতা অপেক্ষা করছে, বাসে করে ভারতীয় দল কখন বেরোবে হোটেলে ফেরার জন্য। অবশেষে পুলিশকে লাঠি চালিয়ে বাস বেরোবার জন্য পথ করাতে হল। বাসের বন্ধ জানলায় এক-একটা শ্রান্ত, হতাশ, বিরক্ত মুখ। রাস্তাতেও বাস লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়া হয়।

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হবার আগেই সি এ বি-র এক কর্তা প্রেসবক্সে এসে বলে যান, চতুর্থ টেস্টের জন্য নির্বাচকরা এখন সভায় বসবেন। বোর্ড-প্রেসিডেন্ট ক্লাব-হাউসের লাঞ্চ-রুমে সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছেন একটায়। সেই বৈঠকেই তিনি নিজে দলের নাম ঘোষণা করবেন।

জীবন এক রিপোর্টারের কাছ থেকে খবরটা পেয়ে বলল, "অন্তু, আমি এইখানেই রইলাম, নামগুলো শুনে তারপর যাব। নীচ থেকে চা খেয়ে আসি, যাবি ?"

ক্লাব-হাউসের উঁচুতে কমপ্লিমেন্টারি আসন থেকে অনন্ত মাঠের দিকে তাকিয়ে। মাথা নেড়ে বলল, "তুই যা।"

মাঠে ছড়িয়ে রয়েছে কাগজ আর লেবুর খোসা। মালিরা সেগুলো পরিষ্কারে ব্যস্ত। মাঝখানে উইকেট ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিশ।

স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বহু মানুষ, এখন এই দুপুরে তাদের বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ততা নেই। ভারতের পরাজয়ে তারা যেন নিস্পৃহ। যেন জানতই এমন হবে।

অনন্ত একদৃষ্টে মাঠের দিকে তাকিয়ে। মনের মধ্যে তোলপাড় হচ্ছে আশা-নিরাশার তরঙ্গ। আর একঘণ্টা পরেই জানা যাবে তার ভাগ্যে কী আছে। সে টেস্ট টিমে আসবে, কি উপেক্ষিত হবে। কালই সে বলেছে 'আমি খেলব।' কিন্তু কবে ?

তিন বছর আগেও সে টেস্ট-খেলার কথায় হেসে বলেছে, 'এখনই অত উচ্চাশা করছি না। আগে বাংলা তারপর আঞ্চলিক···ধাপে-ধাপে ভাবব।'

কিন্তু জীবন তখনই টেস্ট খেলার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল। অনন্তর চোখ আকাশে আটকে রইল। তার মনে হল ঘন মেঘ দ্রুত ধেয়ে আসছে সেদিনের মতো। চারদিকে অন্ধকারের ছায়া ঘিরে ধরছে। গাছের মাথা পাগলের মতো দুলছে। পাখিরা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে। অনন্তর বুক কেঁপে উঠল অজানা ভয়ে।

তারপর !

শব্দ করে বৃষ্টির বড়-বড় ফোঁটা পড়তে শুরু করল। এলোমেলো হাওয়ার ঝাপটায় জলকণা এসে লাগছিল তাদের অনাবৃত শরীরে। জীবন জ্বলজ্বলে চোখে দু'হাত তুলে 'ইয়া হুউউ' বলে চিৎকার করে ছুটেছিল সিড়ির দিকে। লোহার দরজাটা দড়াম করে খুলে প্লেয়ারদের মাঠে যাওয়ার সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে একতলায় নামল। ছুটতে-ছুটতে মাঠে গিয়ে ঘাসের উপর গিয়ে দাঁড়াল। মুখ তুলে অনন্তর দিকে তাকিয়ে দু'হাত তুলে বলেছিল···'অন্তু, আমি টেস্ট খেলব।' আবার বলল 'শুনতে পাচ্ছিস অন্তু, আমি টেস্ট খেলব। ঈশ্বর খবর পাঠিয়েছেন, আমি টেস্ট খেলব।'

বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে গেছল চরাচর। জীবন মাঠে গড়াগড়ি দিচ্ছিল আনন্দে। তখন মোহনদাকে অনন্ত বলেছিল, 'দেখো, জীবন একদিন টেস্ট খেলবেই।' অঝোর বৃষ্টির মধ্যে সে তখন দেখেছিল, জীবন চিত হয়ে আকাশের দিক মুখ করে দু'হাত ছড়িয়ে। নিথর একটা মৃতদেহের মতো। তার বুকটা তখন ধক করে উঠেছিল।

"আহ-হ-হ।" অনন্ত বুকে হাত দিয়ে ঝুঁকে পড়ল। ফিসফিস করে

স্বগতোক্তি করল, "তোর টেস্ট খেলা আর হল না। আমিই শেষ করে দিয়েছি। আমাকে ক্ষমা কর জীবন। আমি পারব না, পারব না। আমি বুকের মধ্যে এই কাঁটা নিয়ে খেলতে পারব না।"

"অন্তু...অন্তু...অন্তু !"

পাগলের মতো কমপ্লিমেন্টারি এনক্লোজারের সিঁড়ি দিয়ে ছুটে উপরে উঠতে উঠতে জীবন পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে।

"অন্তু তুই...।" সিঁড়ির ধাপে ঠোক্কর লেগে জীবন হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

অনন্ত দাঁড়িয়ে উঠল। জীবনের দিকে হাত বাড়িয়ে সে "কী হল" বলে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ছুটে গেল। একটা সিমেন্টের চেয়ারের কোণ জীবনের কপালে লেগেছে। কেটে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। আবার সে উঠে ছুটতে ছুটতে অনন্তর কাছে পৌঁছেই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল বুকে।

"অনতু-উউ...।"

দীর্ঘদেহী অনন্তর বুকের নীচে মুখ চেপে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল জীবন।

"অন্তু, আমি টেস্ট খেলব...তুই বলেছিলি না, আমি খেলব, তুই আমাকে খেলাবি ! মনে পড়ে ?"

জীবন মুখ তুলল। কপাল থেকে রক্তধারা গাল বেয়ে নেমে চোখের জলের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে রয়েছে। দুটি আয়ত চোখে প্রগাঢ় শান্তি। অনন্তর প্রথমেই মনে হল, ঈশ্বরের মুখ বোধহয় এইরকমই।

"অন্তু, তুই চোদ্দজনের মধ্যে রয়েছিস। এইমাত্র টিম অ্যানাউন্স করল পাণিগ্রাহী।"

বাবা ! অনন্তর চোখ আকাশের দিকে ছুটে গেল। একবার থরথরিয়ে কেঁপে গেল তার দেহ। নিজেকে সংযত করে সে বলল, "নীচে মেডিকেল ইউনিটে চল শিগ্গির।"

"না।" ছেলেমানুষের মতো জিদ ধরে জীবন বলল, "তোর কি আনন্দ হচ্ছে না ? আমার বাসনা পূরণ হল, আর তুই কিনা এই সামান্য একটা ছড়ে-যাওয়া নিয়ে এখন ভাবছিস ?" জীবনের দু'চোখ আবার জলে ভরে গেল।

ক্লাব-হাউসের মাথায়, সার-দেওয়া আসনগুলো শূন্য। সারা

স্টেডিয়ামে বসার ধাপগুলো জনহীন। শুধু দুটি মানুষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। একসময় দেখা গেল লম্বা মানুষটি ধীরে-ধীরে নিচু হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে বেঁটে মানুষটির কোমর জড়িয়ে বুকে মাথা রাখল।

পরদিন ভারতের প্রতিটি খবরের কাগজের প্রথম পাতায়, ভারতের টানা তৃতীয় পরাজয়ের কথা নয়, বড় অক্ষরের হেডিংয়ে বেরোল অন্য খবর।

"ভারতীয় ক্রিকেটে ইতিহাস সৃষ্টি।" একটি কাগজের হেডিং।

"টেস্ট-দল থেকে আটজন ছাঁটাই।" আর-একটি কাগজের হেডিং।

"ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত।" একটি হেডিং।

"বোর্ড শোধ তুলল।" একটি হেডিং।

"বোর্ড বুঝিয়ে দিল তার মেরুদণ্ড সবল।" একটি হেডিং।

তারপর খবর। প্রায় প্রতিটি কাগজেরই শুরুতে 'চমকপ্রদ', 'নাটকীয়', 'অকল্পনীয়', 'চাঞ্চল্যকর' প্রভৃতি শব্দ যথেচ্ছ ব্যবহার করে লেখা হয়েছে : "বোর্ড প্রেসিডেন্ট এস পানিগ্রাহি সাংবাদিক সম্মেলনে চতুর্থ টেস্টের জন্য নির্বাচিত ভারতীয় দলের চোদ্দজনের যে নামগুলি পড়ে শোনান তাতে কলকাতা টেস্টে খেলেছেন যে এগারোজন তাদের মধ্যে অধিনায়ক ভার্দে সহ আটজনের নাম নেই। বাকি তিনজন হলেন উসমানি, নবর ও বেঙ্কটরঙ্গন। নতুন অধিনায়ক হয়েছেন আট বছর আগে ভারত দল থেকে বাদ-পড়া গুজরাটের বর্তমান রঞ্জি দলের অধিনায়ক, ৩৯ বছর বয়সী ফিরোজ নওরোজি কাম্বাট্টা। বাইশটি টেস্ট খেলেছেন। যেসব খেলোয়াড় বোর্ডের চুক্তিপত্রের তিনটি ধারা কেটে দিয়ে সই করেছিলেন তারা সবাই বাদ পড়েছেন। শুধু—নবর, আনোখা, উসমানি ও গৌড়া—এই চারজন তরুণ, যারা চুক্তিপত্রের সব শর্ত মেনে সই করেছিলেন তাঁদের এবং বেঙ্কটরঙ্গনকে টেস্ট দলের চোদ্দজনের মধ্যে রাখা হয়েছে।

"বাঙ্গালোর টেস্টের জন্য কাম্বাট্টা সহ উক্ত ছয়জন ছাড়া আর রয়েছেন দু'জন উইকেট কিপার, সঞ্জয় শুক্ল (মধ্যপ্রদেশ), ও বিনয় মারাঠে (মহারাষ্ট্র),ব্যাটসম্যান, দুর্গা দাস (দিল্লি), ও সাম্মি সারিন (হরিয়ানা), দুই স্পিনার, তারসেম কুমার (পঞ্জাব), জ্যোতি পটেল (বোম্বাই) এবং দুজন

পেসার ফারুক মির্জা (হায়দরাবাদ) ও অনন্ত সেন (বাংলা)।"

পাঁচদিন পরই বাঙ্গালোরে টেস্ট ম্যাচ শুরু হবে। অনন্ত রওনা হবে বিকেলের ফ্লাইটে, খেলার তিনদিন আগে। তার আগের দু'দিন সে নাজেহাল হল রিপোর্টার আর ফোটোগ্রাফারদের তাড়ায়। সকাল থেকে তারা বাড়িতে আসছে। নামী, অনামী খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, এমনকী মফস্বলের কাগজের লোকও এসে হাস্যকর প্রশ্ন করে তাকে বিরক্ত করেছে। অবশেষে তনিমাই বললেন, "তুই বাপু সারাদিন জীবনের বাড়িতে গিয়ে থাক। ওরা এলে বলে দেব মামার বাড়ি গেছিস, পরশু রাতে আসবি। পরশু রাতে তখন তো তুই বাঙ্গালোরে পৌঁছে গেছিস!"

"মা, মিথ্যা বলা মহাপাপ কিন্তু!"

"অনেক মিথ্যা আছে, যা বললে পুণ্যি হয়। এটা সেই পর্যায়ের। এখন তোর মানসিক বিশ্রাম দরকার।"

অনন্ত অবশ্য জীবনের বাড়িতে গেল না, জীবনই এল। এক রিপোর্টার যখন অনন্তকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি ইনসুইং না আউট সুইং কোন বল করেন?" তখন জীবনই উত্তরটা দিয়েছিল: "উনি কোনওটাই করেন না, উনি করেন ইন স্পিন আর আউট স্পিন।" রিপোর্টার তাড়াতাড়ি টুকে নিচ্ছিল আর অনন্ত মুচকি মুচকি হাসছিল। তারপর প্রশ্ন করেছিল, "আপনি কখন বাম্পার দিতে পছন্দ করেন?" অনন্ত উত্তর দেবার আগেই জীবন বলে, "শুটার বল দিয়েও যখন উইকেট পায় না তখন বাম্প করায়। শুটার কাকে বলে জানেন তো?" রিপোর্টার মুচকি হেসে বলে, "তা আর জানি না। লং হপেরই তো আর এক নাম শুটার। ক্রিকেটে একই জিনিসের যে কত নাম!"

রিপোর্টার চলে যাবার পর অন্ত, বলে, "লোক বুঝে কথা বলবি। এখন ভারতে কম করে পাঁচ কোটি ক্রিকেট-পণ্ডিত রয়েছে যারা কখনও ব্যাটে বলে হাত দেয়নি। ইনি তাদেরই একজন। কাগজে এখন তোর সম্পর্কে যা বেরোবে একদম পড়বি না। প্রেসার বেড়ে যাবে। ...শোন, আমি কিন্তু বাঙ্গালোর যাচ্ছি, খেলার আগের দিন পৌঁছব। হোটেল রামায় ঘর বুক করেছি। মাঠের কাছেই। তোরা তো থাকবি ফাইভ স্টার ওয়েস্ট এন্ড

হোটেলে। আমার জন্য একটা টিকিট রাখবি, তোর হোটেলে গিয়ে নিয়ে নেব।"

॥ ১৩ ॥

অনন্তর প্লেন বাঙ্গালোরে নামল ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যে। এই 'বাগান-শহরে' তার দ্বিতীয়বার আসা। শুনেছে পরিচ্ছন্ন, সুশ্রী, প্রচুর গাছ আছে। ভারতের নামকরা যন্ত্রপাতির বড় বড় অনেক কারখানা এখানেই। প্লেন থেকে শুরু করে ঘড়ি—ওই সব কারখানায় তৈরি হয়। প্রায় ২৫ লক্ষ লোকের এই শহরের আসল নাম বেঙ্গলুর, সাহেবরা নামটা বদলে বাঙ্গালোর করে দিয়েছে। প্রায় পাঁচশো বছর আগে কাম্পে গৌড়া নামে এক রাজা শহরের পত্তন করেন।

এয়ারপোর্টে কর্ণাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের লোক ছিল। অনন্তকে তারাই হোটেলে নিয়ে যায়। যাবার পথে কৌতূহলী অনন্ত আবার দেখে নিল স্টেডিয়াম, কার্জন পার্ক, বিধান সৌধ, রাজভবন।

হোটেলের দোতলায় তার ঘর। রিসেপশনিস্ট জানিয়ে দিল তার রুমমেট দেশরাজ আনোখা। কিন্তু সে আসবে কাল দুপুরে দিল্লি থেকে। আবার দুজনে একসঙ্গে। দুজনেই পেস বোলার, তাই একসঙ্গে থাকার ব্যবস্থা, যাতে দুজনের মধ্যে ভাব জমে 'সমঝওতা' গড়ে ওঠে। এটা সব ক্রিকেট দলই করে। ওপেনিং ব্যাটসম্যানরা একই ঘরে থাকে, স্পিনাররাও তাই। শুধু অধিনায়ক আর ম্যানেজার আলাদা ঘর পায়।

কাম্বাট্টা দুপুরেই এসেছে। অনন্তর মনে হল ওর সঙ্গে সৌজন্যমূলক দেখা করে নিজেকে পরিচিত করিয়ে নেওয়া উচিত। কাম্বাট্টাকে সে শুধু ছবিতেই দেখেছে। দাড়িওলা, মাঝারি গড়নের লোক। চোখ ঈষৎ কটা এবং সন্দিগ্ধ চাহনি। বাইশ টেস্টে একটি সেঞ্চুরি, ১,০৭২ রান, গড় প্রায় ৩০। আর রঞ্জি ট্রফিতে এখন ১৮ সেঞ্চুরি, ৫২১০ রান, গড় ৫৪। গত মরসুমে চারটি সেঞ্চুরি ও ৬১৯ রান করেছে আট ইনিংসে। এই মরসুমে রঞ্জিতে গত সপ্তাহে তৃতীয় সেঞ্চুরিটি পেয়েছে। এখন কাম্বাট্টা দারুণ ফর্মে রয়েছে।

কাম্বাট্টা সম্পর্কে সে শুনেছে, গম্ভীর, কম কথার মানুষ, ডিসিপ্লিনের

ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। চক্রান্ত করেই বোর্ডের তখনকার একটা উপদল আর অধিনায়ক মৃদুল শর্মা, এখন যে একজন নির্বাচক, তাকে টেস্ট খেলা থেকে হটিয়ে দেয়। ফাস্ট বল খেলতে পারে না, এমন একটা কথা তখন রটানো হয়েছিল।

দরজায় বেল না টিপে অনন্ত আঙুলের টোকা দিল। সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে গম্ভীর স্বর ভেসে এল, "কাম ইন।"

হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে সে ঢুকল। মাঝারি আকারের স্যুইট। ছোট লিভিং রুমে সেন্টার টেবিলে পা তুলে সোফায় আধশোয়া হয়ে কাম্বাট্টা। পরনে সাদা লখনউ চিকনের কাজ-করা পাঞ্জাবি ও পাজামা। সাত আটটা খবরের কাগজ সোফায় ছড়ানো, হাতেও একটা। ঘাড়, গলা, চোয়ালের দৃঢ়তা এবং কাঁধ ও বুকের গড়ন থেকে বোঝা যায় নিয়মিত ব্যায়াম ও শরীরের যত্ন করে।

ঘরে ঢুকেই অনন্ত কোমর থেকে শরীর ঝুঁকিয়ে 'বাও' করল। পা নামিয়ে ডান হাত বাড়িয়ে কাম্বাট্টা সিধে হয়ে বসে বলল, "তুমি অনন্ত সেন ?"

"হ্যাঁ, সার।"

"ফাস্ট বোলারের ফিগার, তাই চিনতে অসুবিধে হয়নি। আমার টিমে রিয়্যাল পেসার তো একজনই···বোসো, কখন এলে ?"

"আধ ঘণ্টা আগে।"

কাম্বাট্টা তীক্ষ্ণ চোখে কয়েক সেকেন্ড তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত। টিমের বেশিরভাগই তাদের স্কিপারকে চেনে না। কিন্তু তাতে কোনও অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। কেননা, আমরা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এই ম্যাচ খেলতে নামব—নিজেদের প্রমাণ করতে। এই উদ্দেশ্যটাই আমাদের মিলিয়ে দেবে, প্রেরণা দেবে। আমরা ক্রিকেটের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠে এসেছি, কেউই আর অপরিণত নই। সুতরাং, বক্তৃতা দিয়ে কাউকেই বলে দিতে হবে না যে, নিজেকে হান্ড্রেড পারসেন্ট ঢেলে দাও, নিংড়ে দাও। নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ তোমরা অপ্রত্যাশিত পেয়ে গেছো···অকল্পনীয়ভাবে এটা এসেছে। আগে, আমাদের সময়ে বাইশ-তেইশ বছর বয়সে টেস্ট খেলা অসাধারণ ট্যালেন্ট

আর সিলেকশন-কমিটিতে গড ফাদার না থাকলে সম্ভব হত না।"

অনন্ত লক্ষ করল কাম্বাট্টার স্বরে সামান্য তিক্ততা উথলে ওঠামাত্র সে চমৎকারভাবে সেটা দমন করে নিল। হঠাৎ সামনে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে বলল, "দেখি তোমার হাত।"

অনন্ত ডান হাত এগিয়ে দিল। সেটা ধরে কাম্বাট্টা মনোযোগ দিয়ে আঙুল, তালু টিপে টিপে পরীক্ষা করল।

"ওয়েট ট্রেনিং করো?"

"হ্যাঁ। বাড়িতেই আমার সরঞ্জাম আছে।"

"ইস্ট জোন ম্যাচে তোমার পারফরম্যানসে অবাক হয়েছি। অস্ট্রেলিয়ানরা কি সিরিয়াস ছিল না?"

"প্রথমে ছিল না। তারপর যখন দেখল ট্যুরে তাদের প্রথম ডিফিট হতে যাচ্ছে, তখন চেষ্টা করেছিল।"

"উইকেট কেমন ছিল?"

"ঘাস ছিল। হার্ড উইকেট, লিফ্‌ট হচ্ছিল। আমার পছন্দের উইকেট।"

"যদি অমন উইকেট এখানে পাও তা হলে কিছু করতে পারবে?"

কঠিন প্রশ্ন। হ্যাঁ বললে মনে হবে বড়াই করছে, বেশি আত্মপ্রত্যয়ী। আবার দ্বিধা দেখালে ভাবতে পারে প্রত্যয় কম, কিলার ইন্‌সটিংকট নেই। চেষ্টা করব বলাটাও বোকামি হবে। ওটা তো করতেই হবে না হলে টেস্ট খেলতে আসা কেন?

"কয়েকটা ব্যাপারের উপর তা নির্ভর করছে।"

কথাটা শুনেই কাম্বাট্টা সিধে হয়ে বসল। তীক্ষ্ণ চাহনি আরও তীক্ষ্ণ হল।

"কী রকম?"

"বিরুদ্ধ দলের মনোবল কেমন, ম্যাচের পরিস্থিতি তখন কী পর্যায়ে, আমার দলের মনোবল কেমন, প্রত্যেকটা সুযোগ নেওয়া হচ্ছে কি না, তা ছাড়া উইকেট আর আবহাওয়াও হঠাৎ চরিত্র-বদল করে ফেলতে পারে। সব থেকে বড় কথা আমার মানসিক আর শারীরিক অবস্থা সেই সময় কেমন থাকবে তার উপর পারফরম্যানস নির্ভর করবে।"

"তুমি জামশেদপুরে এগুলো পেয়েছিলে ?"

অনন্ত উত্তর দিতে গিয়ে থমকে গেল। ভ্রমরার মুখটা চোখে ঝলসে উঠল। কিন্তু দ্রুত সেটা সরে গিয়ে সেখানে এসে গেল একটা কাটা হাত। কানে ফিসফিস শুনতে পেল, 'অন্তু, অন্তু, আমি তোমাকে খুব বড় মনে করি। আমার বন্ধু বলে সেজন্য গর্বও হচ্ছে।'

"হ্যাঁ পেয়েছিলাম।"

"এখন তোমার শরীর ?"

"পারফেক্ট কন্ডিশনে...পায়ের আঙুল থেকে চুল পর্যন্ত।"

কলিংবেল বাজল।

"কাম ইন।" কাম্বাট্টা দরজার দিকে তাকাল। টিম ম্যানেজার রাকেশ খান্না, লোকাল ম্যানেজার রঘু রাও ঘরে ঢুকল। কাম্বাট্টা অনন্তর সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, "আমার মনে হয় শুধু লটন, ব্রাইট বা অ্যামরোজের কথা ভাবলেই আমাদের সমস্যা মিটবে না, কিছু সমস্যা অস্ট্রেলিয়াকেও দিতে হবে...সেন তুমি এখন যেতে পার। নিশ্চয় দশটার মধ্যেই বিছানা নেওয়া তোমার অভ্যাস।"

অনন্ত মাথা নেড়ে, সবাইকে বাও করে ঘর থেকে বেরোল। ডিনারের জন্য হোটেলের রেস্তরাঁয় যাবার সময় তার খটকা লাগল। অস্ট্রেলিয়ার জন্য সমস্যা দেওয়া সেটা কী ব্যাপার ? সেই সমস্যাটা কি অনন্ত সেন ? তা হলে কি সে টিমে আসছে ? তবে কি সে টেস্ট খেলছে !

॥ ১৪ ॥

জীবন তার হোটেলে চেক-ইন করেই চলে এসেছে ওয়েস্ট এন্ড-এ। অনন্তর কাছ থেকে টিকিটটা নিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "আগে কখনও এখানে আসিনি। ভাল জায়গায় সিট তো ?"

"ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে প্লেয়ারদের বসার জায়গা, তার বাঁ দিকে লম্বা লম্বা দশ-বারোটা সারি, সেখানে তোর সিট। ইডেনের মতো ব্যবস্থা নয়। ইচ্ছে করলে ড্রেসিংরুমেও যে কেউ চলে আসতে পারে। দোতলা থেকে একটা সরু সিঁড়ি সোজা মাঠে নেমে গেছে। সিঁড়ির পাশেই প্রেস এনক্লোজার।"

"কী বুঝছিস ? কাল ফাইনাল টিম সিলেকশন, না আজ রাতেই ?"

বাথরুমের দরজা খোলা। থুবিয়ে থুবিয়ে সাবান কাচার শব্দ আসছে। আনোখার ছোটবেলার অভ্যাস, নিজের কতকগুলো ছোটখাট ব্যবহারের জিনিস নিজে কাচা। রুমাল, সোয়েট-ব্যান্ড, মোজা, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া ইত্যাদি সে হোটেলের লন্ড্রিতে দেয় না। এসব নিজে হাতে না কাচলে সে নাকি স্বস্তি পায় না ! তাই সে কয়েকটা জিনিস এখন সাবান দিয়ে কাচছে। কেচে, ঘরে পাখার নীচে চেয়ার-টেবিলের উপর মেলে দেবে।

জীবনের কথা শুনতে পেয়ে আনোখা বাথরুম থেকে চেঁচিয়ে বলল, "সিলেকশন মিটিং এখন ম্যানেজারের ঘরে চলছে। আমার লোক ফিট করা আছে, প্রথম এগারোজনের নাম আমি আজই পেয়ে যাব।"

জীবন বাথরুমের দরজার কাছে গেল। শর্ট্স পরে, খালি গায়ে উবু হয়ে বসে আনোখা কাচছে। সাদা পাথরের মেঝেয় সাবানের ফেনা ছড়িয়ে। জীবন বলল, "তা হলে আমি একটু বসেই যাই। তোমার লোক পাকা খবর দেবে তো ?"

"ম্যানেজার খান্নাই তো আমার লোক। জীবন, তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন, সেন টিমে থাকবেই। এই দু'দিন নেটে স্কিপার ওকে যেভাবে খাটাচ্ছিল, ওর ওপর স্পেশাল নজর দিচ্ছিল, তাতে আমরা ধরেই নিয়েছি সেন আসছে।"

"যদি অন্তু টিমে আসে তোমাকে আমি কলকাতার যে রাবড়ি খাইয়েছি সেই শর্মার রাবড়ি, কিনে পাঠাব।"

"কতটা ?"

"এক কিলো, দু'কিলো··· ।"

"তা হলে আজ রাতেই কলকাতায় ট্রাঙ্ককল করে এক কিলো রাবড়ি বুক করো। কালকের ফ্লাইটেই যেন পৌঁছয়।"

হালকা চালে কথা বলছে আনোখা। ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। অনন্ত ফোন ধরে চেঁচিয়ে বলল, "আনোখা, ফোন।"

স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে আনোখা ছুটে এসে ফোন ধরল।

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি এখনই আসছি।"

রিসিভার রেখে সে পরার জন্য প্যান্ট খুঁজতে চারধারে তাকাল।

"কী বুঝছিস ? কাল ফাইনাল টিম সিলেকশন, না আজ রাতেই ?"

বাথরুমের দরজা খোলা। থুবিয়ে থুবিয়ে সাবান কাচার শব্দ আসছে। আনোখার ছোটবেলার অভ্যাস, নিজের কতকগুলো ছোটখাট ব্যবহারের জিনিস নিজে কাচা। রুমাল, সোয়েট-ব্যান্ড, মোজা, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া ইত্যাদি সে হোটেলের লন্ড্রিতে দেয় না। এসব নিজে হাতে না কাচলে সে নাকি স্বস্তি পায় না ! তাই সে কয়েকটা জিনিস এখন সাবান দিয়ে কাচছে। কেচে, ঘরে পাখার নীচে চেয়ার-টেবিলের উপর মেলে দেবে।

জীবনের কথা শুনতে পেয়ে আনোখা বাথরুম থেকে চেঁচিয়ে বলল, "সিলেকশন মিটিং এখন ম্যানেজারের ঘরে চলছে। আমার লোক ফিট করা আছে, প্রথম এগারোজনের নাম আমি আজই পেয়ে যাব।"

জীবন বাথরুমের দরজার কাছে গেল। শর্ট্স পরে, খালি গায়ে উবু হয়ে বসে আনোখা কাচছে। সাদা পাথরের মেঝেয় সাবানের ফেনা ছড়িয়ে। জীবন বলল, "তা হলে আমি একটু বসেই যাই। তোমার লোক পাকা খবর দেবে তো ?"

"ম্যানেজার খান্নাই তো আমার লোক। জীবন, তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন, সেন টিমে থাকবেই। এই দু'দিন নেটে স্কিপার ওকে যেভাবে খাটাচ্ছিল, ওর ওপর স্পেশাল নজর দিচ্ছিল, তাতে আমরা ধরেই নিয়েছি সেন আসছে।"

"যদি অন্তু টিমে আসে তোমাকে আমি কলকাতার যে রাবড়ি খাইয়েছি সেই শর্মার রাবড়ি, কিনে পাঠাব।"

"কতটা ?"

"এক কিলো, দু'কিলো··· ।"

"তা হলে আজ রাতেই কলকাতায় ট্রাঙ্ককল করে এক কিলো রাবড়ি বুক করো। কালকের ফ্লাইটেই যেন পৌঁছয়।"

হালকা চালে কথা বলছে আনোখা। ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। অনন্ত ফোন ধরে চেঁচিয়ে বলল, "আনোখা, ফোন।"

স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে আনোখা ছুটে এসে ফোন ধরল।

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি এখনই আসছি।"

রিসিভার রেখে সে পরার জন্য প্যান্ট খুঁজতে চারধারে তাকাল।

অনন্তর সোয়েট-সুটটা হাতের কাছেই। সেটাই দ্রুত পায়ে গলাতে গলাতে বলল, "খান্নাসাব ডেকেছেন ওর ঘরে।"

আনোখা বেরিয়ে যেতে অনন্ত ও জীবন পরস্পরের মুখের দিকে অস্থির চোখে তাকাল।

"অন্তু আমি নার্ভাস ফিল করছি।"

"আমিও।"

আনোখার খাটের উপর টু-ইন-ওয়ানটা পড়ে রয়েছে। অনন্ত সেটা তুলে নিয়ে ক্যাসেট-প্লেয়ারের বোতাম টিপল। রক সঙ্গীতের চিৎকার আর ধুমধাম ড্রাম ও ঢাউস খত্তালের শব্দে ঘর ভরে উঠল। অনন্ত একদমই পছন্দ করে না এইসব গান। কিন্তু এই মুহূর্তে তার উত্তেজিত স্নায়ুতে এই শব্দের আঘাত যেন ভালই লাগছে।

জীবন ঘড়ি দেখল। অনন্ত দরজার দিকে মুখ ফেরাল।

"কখন ফিরবে?"

"কী জানি।"

"যদি ফিরে এসে বলে তোর নাম নেই?"

"নেই তো নেই। তাতে কি আমি মরে যাব?"

"আজ যেন বড্ড গরম, তুই ঘামছিস।"

"এ সি চলছে।"

"একটু বাড়িয়ে দে।"

অনন্ত উঠে গিয়ে এয়ার-কুলারের রেগুলেটার বাড়িয়ে দিল।

"অন্তু তুই ঘামছিস, মুখে জল দিয়ে আয়।"

"ঠিক আছে।"

"না না, যা বলছি শোন। মুখে-চোখে জলের ছিটে দে। ঠাণ্ডা হবে শরীর।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনন্ত হাওয়াই চটিটা পায়ে গলিয়ে বাথরুমের দিকে এগোল। সে বাথরুমে ঢুকেছে আর সেই সময়েই ঘরের দরজা দড়াম করে খুলে গেল। আনোখা দাঁড়িয়ে। জীবন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল তার দিকে।

"রাবড়িইইই—আনোখা দু'হাত মুঠো করে চিৎকার করে উঠল।

বাথরুম থেকে অনন্তর উৎকণ্ঠিত গলায় "আমার নাম··· " এই কথা দুটো ভেসে আসার সঙ্গে সঙ্গে পিছলে গিয়ে ধপাস করে পড়ার শব্দ শোনা গেল।

"আআহ্··· জীবন, একবার আয় তো।"

"কী হল, কী হয়েছে অন্তু ?" প্রা একপাটি চটি ছিটকে বাথটাবের কাছে। দু'হাতে ভর দিয়ে অনন্ত ওঠার চেষ্টা করছে।

"আনোখা, আনোখা।" জীবন বগলের নীচে হাত রেখে অনন্তকে তোলার চেষ্টা করতে করতে ডাকল।

ততক্ষণে আনোখা এসে পড়েছে। নিজের কপালে একটা চড় মেরে সে "হায়, এ কী কাণ্ড !" বলে সে অনন্তকে টেনে দাঁড় করাল।

"আমারই গলতি হয়ে গেছে। জল দিয়ে সাবান ধুয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ফোনটা আসতেই এত ব্যস্ত হয়ে গেলুম।" আনোখা অনুতপ্ত গলায় বলল।

"আমিই ওকে মুখে-চোখে জল দেবার জন্য বলেছি। তাই শুনেই ও বাথরুমে··· " জীবনের গলা ধরে গেল।

"কী বললেন খান্নাসাব ?" অনন্ত ধীরে ধীরে হেঁটে এসে খাটে বসল।

আনোখার মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। "সেন তুমি ফার্স্ট ইলেভেনে আছ।"

"অন্তু, তা হলে তুই টেস্ট খেলাছস।" জীবনের চোখের কোণ চিকচিক করে উঠল।

"সেন তোমার কোথাও লেগেছে কি না দ্যাখো, তা হলে এখনই ডাক্তারকে খবর দেব।"

"না না, ডাক্তার নয়।" জীবন ব্যস্ত হয়ে বলল, "অন্তু, হেঁটে চলে দ্যাখ তো।"

অনন্ত উঠে দাঁড়িয়ে ঘরে হাঁটতে লাগল।

"না অ্যাঙ্কেলে বা হাঁটুতে কিছু হয়নি। একেবারে থেবড়ে বসে পড়েছি তো।" অনন্ত তার শিরদাঁড়ার নীচের দিকে লাম্বারেরও তলার অঞ্চলে হাত রেখে বলল।

"একটু সামনে ঝুঁকে দ্যাখো তো ?"

আনোখার কথায় সে সামনে ঝুঁকেই বলল, "সামান্য লাগছে।"

"ফলো থ্রু-র অ্যাকশনে একবার দ্যাখ। জীবনের গলা কেঁপে উঠল।

ঘরের ফাঁকা জায়গায় অনন্ত চার-পাঁচ কদম দ্রুত হেঁটে গিয়ে ডেলিভারি দেবার জন্য লাফিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ল বাঁ পায়ে দেহের ভার রেখে।

"আঃ।" অস্ফুট কাতরানি তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

"লাগছে ?" আনোখা হাত রাখল অনন্তর পিঠে। "কাল জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নামবে। হান্ড্রেড পারসেন্ট ফিট না হলে তো তোমার মাঠে নামাই হবে না! আর একবার করো, তারপর বলো লাগছে কি না।"

"না না আর করতে হবে না।" জীবন হঠাৎ কেমন রুক্ষ, ব্যস্ত স্বরে বলে উঠল, "অন্তু হান্ড্রেড পারসেন্টই ফিট রয়েছে।"

"জীবন তুমি বুঝছ না... "

"খুব বুঝছি। আনোখা, ক্রিকেট আমিও একসময় খেলেছি। আজ রাত্তিরটা রেস্ট নিলেই কাল ঠিক হয়ে যাবে ব্যথা-টাথা। ডাক্তার দেখিয়ে আর ঝামেলা পাকাতে হবে না। আনোখা তুমি ডাক্তার ডেকো না আর এই ব্যাপারটা কাউকে বলতেও যেও না।"

"ইনজুরিটা চেপে যাবে!"

"হ্যাঁ যাবে।" জীবন হঠাৎ যেন খেপে উঠল। "এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে এসে অন্তু টেস্ট খেলতে পারবে না! তাই খনও হয়!"

"কিন্তু খুব ভুল করা হবে তা হলে। স্কিপার যদি জানতে পারে... জীবন তুমি কি এই ম্যাচটার গুরুত্ব বুঝতে পারছ না ? বোর্ড কি ঝুঁকি নিয়েছে, এতগুলো নতুন ছেলের কেরিয়ার এই ম্যাচের উপর কতটা নির্ভর করছে, এসব কি তুমি বুঝতে পারছ না ?"

"পারছি। কিন্তু অন্তুর এই ঘটনাটা কেন ঘটল বলতে পার ? তুমি যদি কেয়ারলেস না হতে, তুমি যদি বাথরুমের মেঝেতে সাবানের ফেনা ছড়িয়ে না রাখতে তা হলে ওর এই অবস্থা হত না।"

"সেন আমি সরি, সত্যিই দুঃখিত। ইচ্ছে করে তো আর এটা করিনি।" আনোখা বিষণ্ণ চোখে তাকাল।

কিন্তু জীবন তাকাল অন্য দৃষ্টিতে চোখ-দুটো সরু করে। তাই দেখে আনোখা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে।

"জীবন তুমি কি ভাবছ আমি ইচ্ছে করে··· !"

জীবন গম্ভীর হয়ে রইল।

"জীবন, তুই কী বলছিস ? একদমই বাজে ধারণা তোর। আনোখা আমার বন্ধু, আমার হিতৈষী। এরকম নোংরা জিনিস ওর মনে কখনওই আসে না।" এতক্ষণ পর অনন্ত কথা বলল। "আমার কিছু হয়নি। ওটুকু ব্যথা তো যখন তখন হয়। এই তো সেদিন ফিল্ড করার সময় ঝাঁপালাম, কাঁধে লাগল, আবার তিন মিনিট পরেই বল করলাম।"

"আনোখা, তা হলে তুমি ডাক্তার ডেকো না আর। ব্যাপারটা কাউকে বোলো না। শুনলে তো ও নিজেই বলল, ওর লাগেনি।"

আনোখার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে রয়েছে। সে শুধু বলল, "তাই হবে।

॥ ১৫ ॥

ভোরবেলায় অনন্তর ঘুম ভাঙল, প্রথমেই তার মনে এল আজ জীবনের নতুন একটা অধ্যায় শুরু হবে। বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে অস্ফুটে অনন্তর মুখ থেকে একটা কাতর শব্দ বেরিয়ে এল। সে চকিতে পাশের বিছানার দিকে তাকাল। আনোখা ঘুমিয়ে রয়েছে। দু'হাতে ভর দিয়ে সে উঠে বসল। কী অদ্ভুতভাবেই না অধ্যায়টা শুরু হতে যাচ্ছে। জানলা দিয়ে দেখল ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশ মেঘলা।

হাঁটতে অসুবিধা হল না। কিন্তু ব্যথাটা অনুভব করছে। অনন্ত হালকা পায়ে ঘরের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে বিছানায় বসতেই শিরদাঁড়ার নীচের দিকে চাপ পড়ে যন্ত্রণার খোঁচা লাগল। সে উঠে দাঁড়াল। ভাবল, রেস্ট নিলে, গরম সেঁক আর মালিশ করে, কয়েকটা পেইন কিলিং ট্যাবলেট খেলেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এসব করতে গেলেই তো জানাজানি হয়ে যাবে ! তার থেকেও বড় কথা, জীবন যে ইঙ্গিতটা কাল করে গেছে তাতে আনোখা রীতিমত আহত হয়েছে, মুষড়েও পড়েছে।

অথচ সত্যিই ওর কোনও দোষ নেই। বেচারিকে দোষমুক্ত করার জন্যই তাকে এই ম্যাচে বল করে বুঝিয়ে দিতে হবে তার কোনও চোট নেই। নয়তো আনোখা মরমে মরে থাকবে। এইভাবে ওর বুকে পাষাণভার চাপিয়ে দেওয়াটা জীবনের উচিত হয়নি। বন্ধুর জন্য উপকার

করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বন্ধুকেই সে অপ্রতিভ করে দিয়েছে। ওকে বলতে হবে, তুই বাপু আর বেশি কথা বলিসনি। এই হোটেলে আর আসিসনি।

ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে "অনন্ত সেন স্পিকিং" বলতেই ওধার থেকে জীবন বলল, "অন্তু ব্যথাটা কেমন ?"

"দ্যাখ জীবন, তুই কাল খুব অন্যায় কাজ করেছিস ওভাবে আনোখাকে বলে।"

"চুলোয় যাক আনোখা। তুই নিজের কথা আগে ভাব। ব্যথা আছে এখনও ?"

"না।"

"বাঁচালি। কাল সারারাত আমি..."

অনন্ত ফোন রেখে দিল।

"জীবন ফোন করেছে ?"

"সে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখল আনোখা বিছানায় উঠে বসেছে।

"না। আমার এক বন্ধু, এখানেই থাকে। কনগ্র্যাচুলেট করল।"

"তোমার ইনজুরিটা এখন..."

"ঠিক আছে। পারফেক্টলি অলরাইট।"

মাঠে পৌঁছে যখন সে নেটে বল করতে গেল একটা ব্যাপারে সতর্ক থাকল, কোনওভাবেই যেন সে ঝুঁকে না পড়ে। ছুটে আসার ঝাঁকুনিতে মনে হচ্ছে গরম শিক দিয়ে যেন শিরদাঁড়ার নীচে কেউ খোঁচা দিচ্ছে। প্রায় দাঁড়িয়ে সে বল করার চেষ্টা করল, ফলো-থ্রুতে না গিয়ে।

"কী ব্যাপার, এমনভাবে বল করছ কেন ? ঠিকভাবে বল করো।" কাম্বাট্টা এগিয়ে এসে বলল।

"হ্যাঁ করছি। হাত-পা'টা ছাড়িয়ে নিচ্ছিলাম।"

এগারো পা ছুটে এসে অনন্ত এর পরের ডেলিভারিটা করেই ঝোঁকা অবস্থায় চার-পাঁচ পা এগিয়ে গেল। যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত হয়ে উঠেছে, কিন্তু মুখ থেকে শব্দ বার হতে দিল না। ব্যাট করছে উসমানি। পিছিয়ে গিয়ে ডিফেন্সিভ খেলেছে। বলটা গড়িয়ে আসছে অনন্তর দিকেই। নিচু হয়ে বলটা তোলার ভরসা তার হল না। পা দিয়ে থামিয়ে হাঁটু ভেঙে হাতটা নামিয়ে দিয়ে সে বল কুড়োল। ব্যাপারটা লক্ষ করল শুধু দুটি

লোক। আনোখা আর স্টেডিয়ামে বসা জীবন।

পরপর তিনটি টেস্টম্যাচ ভারত হেরে যাওয়ায় সিরিজের আকর্ষণ উবে গেছে। তার উপর নামী খেলোয়াড় একজনও নেই। এই টেস্টও তো গোহারান হারবে। তার উপর মেঘলা আকাশ। গত রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ ভোরেও দু'পশলা হয়েছে। খেলা তো যে কোনও সময় বন্ধ হয়ে যাবে, পয়সা উশুল হবে না। তার থেকে বাড়িতে টিভি দেখাই বিবেচকের মতো কাজ হবে। বোধহয় এইসব কারণেই টিকিট বিক্রি হয়নি। স্ট্যান্ডের অধিকাংশ জায়গাই জনশূন্য।

টস জিতেছে কাম্বাট্টা। ভারত ব্যাট করবে। অনন্তর বুক থেকে বিরাট একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। আজকের দিনটা তা হলে আর বল করতে হচ্ছে না। পুরোই রেস্ট পাওয়া যাবে। ভারত কি সারা দিনটা ব্যাট করে যেতে পারবে না? প্যাড পরে উসমানি আর সারিন চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে। দ্বাদশব্যক্তি বিনয় মারাঠে। অফ স্পিনার গৌড়া স্থানীয় ছেলে। তাকে আর লেগ স্পিনার বোম্বাইয়ের জ্যোতি পটেলকে রিজার্ভে রাখা হয়েছে। দলে মাত্র একজন স্পেশালিস্ট স্পিনার, পঞ্জাবের তারসেম কুমার। অবশ্য কাম্বাট্টা নিজেও ভাল অফ ব্রেক করায়। কিন্তু মাত্র একজন খাঁটি স্পিন বোলার নিয়ে ভারত কবে শেষবার টেস্ট খেলেছে, অনেকেই তা বলতে পারল না। যেমন অনেকেই মনে করতে পারল না, চারজন পেস বোলার নিয়ে—আনোখা, অনন্ত সেন, দুর্গা দাস আর ফারুক মির্জা—ভারত আদৌ কখনও টেস্টম্যাচ খেলেছে কি না!

ভারত দলের এগারো জনের নাম যখন প্রেসবক্সের স্কোরার চেঁচিয়ে জানিয়ে দিচ্ছিল, তখন এক সাংবাদিক সবাইকে শুনিয়ে বিদ্রূপ করে বলে ওঠে: "ওরে বাবা, অ্যাতো পেস বোলার! ওয়েস্ট ইন্ডিজ হয়ে গেল নাকি ইন্ডিয়া টিম?"

তখন আর একজন টিপ্পনি কাটে: "ফিরোজ নওরোজি লয়েড কি আমাদের স্কিপার?"

"এইবার গ্রিনিজ আর হেইন্স ব্যাট করতে নামবে। লটন আর ব্রাইটের কী দুর্দশা যে এবার হবে!"

বোলান অস্ট্রেলিয়া দলকে নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। তাদের বাঁ হাতি

লেগ স্পিনার লেসলি প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলবে। উসমানি আর সারিন মাঠে নামতে কিছু হাততালি পড়ল।

অনন্তর চোখ খুঁজে বার করছে জীবনকে। সামনে থেকে চতুর্থ সারিতে, মাঝামাঝি জায়গায়। তবে ওর চেয়ারের পাশ দিয়েই যাতায়াতের পথ। ড্রেসিং রুমে টি ভি সেট রয়েছে। অনন্ত ঠিক করল, চেয়ারে কাত হয়ে পা ছড়িয়ে সে টিভি-তেই দেখবে। বাইরে ওইভাবে বসে খেলা দেখা সম্ভব নয়।

প্রথম দুটো ওভার মেডেন। প্যাড পরে কামবাট্টা থুতনিতে হাত রেখে টিভি-র সামনে। ওর চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না মনের খবর। অনন্ত বসেছে কাম্বাট্টার পিছনে।

সাত ওভার হয়ে গেছে। উসমানি লটনকে দুটো স্ট্রেট ড্রাইভে বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে নয় রানে। ব্রাইটের বল আচমকা লাফাল প্রায় গুড লেংথ থেকে। উসমানি মুখের কাছে ব্যাট তুলল। শর্ট লেগ রজার্সের হাতের মধ্যে বলটা পড়ল। ১২ রানে ভারত প্রথম উইকেট হারাল। টিভি পরদায় দেখা গেল নবর নামছে। কাম্বাট্টা পরের ব্যাটসম্যান। ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল। উসমানি গম্ভীরমুখে ঘরে ঢুকল। গোঁজ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে প্যাড খুলতে শুরু করল।

যেন জমি আঁকড়ে পড়ে থাকার প্রতিযোগিতা। সারিন আর নবর, দু'জনে মিলে ৬৫ রান তুলল ৩০ ওভার খেলে। শুধু একবারই সারিন ধৈর্য হারিয়ে পরপর লটনকে দু'বার হুক করে বাউন্ডারিতে পাঠিয়েই নিজেকে ধামাচাপা দিয়ে ফেলে।

ভারতের ৭৭ রানে সারিন উইকেটকিপার ফেলপসের গ্লাভসে অ্যামরোসের একটা অফ-কাটার পৌঁছে দিয়ে ফিরে এল ৩০ রান করে। কাম্বাট্টা নামল এবং অ্যামরোসের প্রথম দুটো বল থেকে হুক করে চার, অন ড্রাইভ করে তিন রান নিল। ক্রিমোন মাঠ হঠাৎ গরম হয়ে উঠল।

সারিন ফিরে আসতেই আনোখা জিজ্ঞাসা করল, "উইকেট কী বুঝছ?"

"ব্যাটিং উইকেট। স্লো। একটু ভিজে ভিজে। উসমানির বলটা কেন যে লাফাল বুঝতে পারছি না।"

নবর ফিরে এল চায়ের আগের ওভারে, ঠিক সারিনেরই মতো

অ্যামরোসের অফ-কাটারে ফেলপসের হাতে। নবরের ৪৩ রান দর্শনীয় নয়, কিন্তু উপযোগিতায় তুলনাহীন। ভারত তিন উইকেটে ১১৬। বেঙ্কটরঙ্গন ফিরে এল পাঁচ রান পরেই। অলরাউন্ডার দুর্গা দাস এসে কাম্বাট্টার সঙ্গে কথা বলে একটা ব্যাপারেই মগ্ন হল—ব্যাটিংয়ের কাজটা অন্যজনের ঘাড়ে তুলে দেওয়া। আর কাম্বাট্টা পেস বোলারদেরই বেছে নিল তার বিরুদ্ধে রটনাকারীদের উদ্দেশ্যে জবাব পৌঁছে দেবার জন্য। ৫৭ রানের জ্বলজ্বলে ইনিংস খেলে স্লিপে লেসলির হাতে ধরা পড়ল লটনের বলে। ভারত ১৬০-৫।

এরপরই অনভিজ্ঞতা বেরিয়ে এল ভারতের ব্যাটিং থেকে। দুর্গা দাস কাম্বাট্টার পিছু পিছুই ফিরে এল ১৬ রান করে এবং লেসলিকে প্রথম টেস্ট উইকেট দিয়ে। সঞ্জয় শুক্ল তার প্রথম টেস্ট ইনিংসে শূন্য রান করল। মির্জা করল এক রান। তিনজনই পিটিয়ে বোলিং ছাতু করতে চেয়েছিল। কিন্তু অনন্ত চেয়েছিল প্রথম বলেই আউট হয়ে ফিরে আসতে।

ব্যাট ধরে ঝুঁকে যাতে স্টান্স না নিতে হয় সেজন্য সোজা হয়ে ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে থেকে লেসলির বলে প্রায় চোখ বুঁজেই অনন্ত ব্যাট চালায়। তিন বলে তিনটি ছয় বোলারের মাথার ওপর দিয়ে। চতুর্থ বলে স্টাম্পড। হাঁফ ছেড়ে সে ফিরে এল চেয়ারে বসা কাম্বাট্টার পাশ দিয়েই। তখন একবার কাম্বাট্টা তার মুখের দিকে তাকাল মাত্র। সেই মুখে ছিল থমথমে রাগ।

দিনের শেষে ভারত করল নয় উইকেটে ২০৩ রান।

"তোমরা কি একজিবিশন ম্যাচ খেলছ?"

ড্রেসিং রুমে কাম্বাট্টা ঠাণ্ডা গলায় কথাটা বলল। স্বরে কাঠিন্য। সবাই চুপ। অনেকের মাথ নিচু হয়ে গেল।

"এটা পাঁচ দিনের ম্যাচ, ওয়ান-ডে ম্যাচ নয়। বারবার বলে দিলাম, ধরে ধরে খেলো। কেউ শুনলে না। এভাবে টেস্ট খেলা হয় না। কেউ নিজেকে ঢেলে দেবার চেষ্টা করলে না। তোমাদের কি উচ্চাশা নেই? একটা টেস্ট ম্যাচ খেলেই কি মনে করছ, জীবন সার্থক হয়ে যাবে? তোমাদের উপর বোর্ড ভরসা রেখে প্রতিষ্ঠিত নামী প্লেয়ারদের বাদ

দিয়েছে। তার প্রতিদান কি এইভাবে দেবে ? তোমাদের নিজেদেরও কি নিজের সম্পর্কে উঁচু ধারণা নেই, মর্যাদাবোধ নেই ?'

এরপর কাম্বাট্টা একে একে প্রত্যেকের খেলার ত্রুটির কথা বলতে বলতে অনন্তর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার কী হয়েছে ? ওইভাবে স্টান্স নিয়ে ব্যাট করার কারণ কী ? নিচু হতে অসুবিধে হচ্ছে ?"

বুক শুকিয়ে গেল অনন্তর। আমতা আমতা করে বলল, "তা নয়। লেসলির ফ্লাইট বুঝতে অসুবিধা হয় বলেই দাঁড়িয়ে খেলছিলাম।"

"অ।"

মাত্র একটি শব্দ ও সন্দিগ্ধ চাহনি মারফত কাম্বাট্টা জানিয়ে দিল অনন্তর যুক্তি তার বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি।

লাক্সারি কোচে হোটেলে ফেরার সময় আনোখা ফিসফিসিয়ে বলল, "খুবই কি ব্যথা লাগছে ? কাল বল করতে হবে।"

অনন্ত মাথা নাড়ল। যার অর্থ হ্যাঁ এবং না দুইই হয়।

হোটেলে কোচটা দাঁড়াতে সবাই সার দিয়ে নামতে শুরু করল। অনন্তর ঠিক আগেই কাম্বাট্টা। রুমালে মুখ মুছছে, কাঁধে একটা চামড়ার ব্যাগ। কোচের দরজা দিয়ে নামার সময় কাম্বাট্টার হাত থেকে রুমালটা জমিতে পড়ে গেল। পিছনে অনন্ত।

"সার, ইওর কারচিফ!"

কাম্বাট্টা এগিয়ে গেছে কয়েক পা, ঘুরে দাঁড়াল। অনন্ত ঝুঁকে তুলতে গিয়ে "উঃ হ-হ-হ" বলেই সিধে হয়ে গেল। তারপর শরীরটাকে খাড়া রেখে হাঁটু ভেঙে নিচু হল, হাত ঝুলিয়ে।

রুমালটা হাতে নিয়ে কাম্বাট্টা লোহার মতো কঠিন স্বরে বলল, "এখনই ডাক্তার দেখাও। ঘরে যাও, আমি আসছি।"

কাম্বাট্টা দ্রুত পায়ে ভিতরে ঢুকে গেল। অনন্ত তখন দুটো ব্যাপার বুঝতে পারল। রুমালটা ইচ্ছে করেই ফেলা হয়েছে তার চোট আছে কি না পরীক্ষা করতে আর এবার কপালে প্রচণ্ড দুর্ভোগ আছে।

ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে শর্ট-ওয়েভ সেঁক দিয়ে ব্যথা সারার কয়েকটা বড়ি দিলেন খাওয়ার জন্য। বললেন, "বিশ্রাম ছাড়া আর কিছু করার নেই।"

ফিরে আসামাত্র কাম্বাট্টা তার ঘরে অনন্তকে ডেকে পাঠাল। অনন্ত ঘরে ঢুকে দেখল রাকেশ খান্নাও বসে। দু'জনের মুখ থমথমে।

"তোমার কাছ থেকে এই মিথ্যাচার আমি আশা করিনি। জানো, তুমি কত ক্ষতি করলে, শুধু এই টিমেরই নয়, দেশেরও ? তুমি কি ভুলে গেছ, ক্লাবের নয় দেশের হয়ে খেলছ, কোটি কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছ ?"

কাম্বাট্টার গলা মৃদু থেকে ধীরেধীরে উচ্চগ্রামে উঠতে শুরু করল। অনন্তর মাথা ক্রমশ নীচের দিকে নেমে এল। খান্না চুপ করে একদৃষ্টে তাকিয়ে তার মুখের দিকে।

"কাল রাতেই তুমি বলতে পারতে। আজ সকালেও বলতে পারতে টিমের নাম সাবমিট করার আগে। তা হলে একটা সুস্থ লোককে দলে নিতে পারতাম ! আমার প্ল্যানিংয়ে তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এখন প্ল্যানটাই ভেঙে পড়ল। সব ওলটপালট, ছত্রাকার হয়ে গেল।"

কাম্বাট্টা মাথা নিচু করে কী যেন ভাবছে। অনন্ত ক্রমশ পাথরে রূপান্তরিত হচ্ছে দেহে রক্ত চলাচল করছে না, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ, চোখের পলকও পড়ছে না। তার আর কিছু বলার নেই। অন্যায়, চরম অন্যায় সে করেছে। কোনও কৈফিয়ৎ, কোনও অজুহাত তার দেবার নেই। এত দুঃখজনক অপমানের সামনে সে কখনও দাঁড়ায়নি। এখন মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই তাকে উদ্ধার করতে পারবে না। কিন্তু সে যে পাথর হয়ে যায়নি সেই প্রমাণ দিতেই বোধহয় তার দু'চোখ থেকে টপ্‌টপ্‌ জল পড়ল।

"কী বিরাট ঝুঁকি নিয়ে, নামী প্লেয়ারদের ছাঁটাই করে তোমাদের মতো তরুণদের ভরসায়, তোমাদের উপর আস্থা রেখে এই দলটা গড়া হয়েছে। সারা দেশে এজন্য সমালোচনার ঝড় বয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যা করলে..... সেন,তুমি শিশু নও। টেস্ট খেলার লোভটা তুমি সামলাতে পারলে না ?"

গ্রিক ট্র্যাজিক নাটকের নায়কের মতো যেন কাম্বাট্টার হাহাকার সারাঘরে ধ্বনিত হল। চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে সে পায়চারি করছে। খান্নার চোখ তাকে অনুসরণ করে যাচ্ছে।

"লোভ....আকাঙ্ক্ষা.....মানুষকে কোথায় যে নিয়ে যায় !" কাম্বাট্টার স্বগতোক্তি সবাই শুনতে পাচ্ছে। "কত বছর অপেক্ষা করেছি এই দিনের

জন্য। যেসব কালি আমার মুখে মাখানো হয়েছে তা মুছে ফেলে দেখিয়ে দেব আমি পেসারদের খেলতে পারি। লটন। ব্রাইট। অ্যামরোজ।.....ফুঃ। এই টেস্ট আমি জিততাম, এই উইকেট ক্রমশ খারাপ হবে। অস্ট্রেলিয়াকে দেড়শো'র মধ্যে নামাতে পারতুম যদি .....এই মুর্খটা আমাকে না ঠকাত।"

অনন্ত আর সহ্য করতে পারল না। সে তাড়া-খাওয়া একটা জখম পশুর মতো ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিজের ঘরে এসে দেখল আনোখা ফোনে কার সঙ্গে কথা বলছে। তাকে দেখামাত্র সে অন্যদিকের লোকটিকে বলল, "এসে গেছে, তুমি কথা বলো।" আনোখা রিসিভারটা অনন্তর দিকে এগিয়ে ধরে বলল, "জীবন"।

হিংস্র একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল অনন্তর মুখ থেকে। রিসিভারটা ছিনিয়ে নিল সে।

"জীবন ?"

"হ্যাঁ। কী বলল কাম্বাট্টা ?"

"জীবন, তুই আমার চরম ক্ষতি করেছিস। চরম সর্বনাশ করেছিস। আমার আর কোথাও মুখ দেখানোর উপায় রইল না। আমি মিথ্যাবাদী, আমি ঠকবাজ, আমি লোভী.... আমি অনেক লোকের ক্ষতি করেছি..... আমি দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি..... প্রত্যেকটা কথাই সত্যি। আমি মাথা নামিয়ে সব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি..... এর জন্য কে দায়ী জানিস.... তুই, তুই!"

অনন্ত এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে হাঁফাচ্ছে। ঠোঁটের কষে ফেনা জমেছে। আনোখা অবাক চোখে তাকিয়ে। ওধারে জীবন নীরব।

"এখন আমার মনে হচ্ছে, কেন সেদিন আমি স্কুটার চালাতে গেলাম, কেন অ্যাকসিডেন্টটা করলাম, কেন তোর হাতটা নষ্ট হবার জন্য নিজেকে দায়ী করলাম, কেন তুই বললি অন্তু আমার আর টেস্ট খেলা হবে না, কেন কেন কেন..... তুই আমাকে চোটের কথাটা লুকিয়ে যেতে বললি কেন, তা হলে এখন এই অপমান সইতে হত না। জীবন, এখন আমার ঘেন্না হচ্ছে নিজের উপর। আমি মায়ের সামনে দাঁড়াব কোন মুখে, বাবার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে কী জবাব দেব ?..... তোমার শিক্ষা আমি পা দিয়ে

চটকেছি, তোমার উঁচু মাথা আমি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছি..... জীবন, আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে, সুইসাইড..... ।"

অনন্ত রিসিভারটা ক্রেডলে রাখামাত্র আনোখা এগিয়ে এসে ওর হাত ধরল ।

"কী বললে ? সুইসাইড ? না সেন, এসব চিন্তা কোরো না । লাইফের দাম অনেক, এত সহজে তা নষ্ট কোরো না । তোমার এই চোটের জন্য তো আমিই দায়ী । আমি যদি কেয়ারফুল হতাম.... জীবন কাল যা বলেছে ঠিকই ।"

অনন্তর পিঠে একটা থাপ্পড় দিয়ে উচ্ছলস্বরে আনোখা বলল, "আরে ইয়ার, ম্যাচের তো সবে প্রথম দিন খতম হল, এখনও চারদিন চলবে । দ্যাখো, কাল কী রকম বল করি । ফটাফট অস্ট্রেলিয়াকে থামিয়ে দেব । মন খারাপ কোরো না ।"

অনন্ত উবুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে রইল । টেপ রেকর্ডারে রক গান বাজছে । কিছুই তার কানে ঢুকছে না । রাতে সে আনোখার বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও খেতে গেল না ।

পরদিন সকালে ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে জানালেন, বল করা চলবে না, তা হলে চোটটা জটিল অবস্থায় পৌঁছবে । নড়াচড়া না করাই এখন দরকার ।

"তোমায় মাঠে যেতে হবে না । ঘরেই থাকো ।"

খান্না কথাটা বলে বিরক্ত মুখে চলে গেল । কাম্বাট্টা একবারও দেখতে আসেনি অনন্তকে । তবে দলের সবাই এসে তাকে দেখে গেছে । প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে অনন্তর মনে হল, সবাই যেন অভিযোগ নিয়ে এসেছে— তুমি আমাদের বসিয়ে দিলে ।

আনোখার টু-ইন-ওয়ানটা বিছানায় পড়ে রয়েছে । অনন্তর অনেকবার ইচ্ছে হয়েছে রিলে শোনার । কিন্তু ভয়ে সে হাত বাড়ায়নি ।

বারোটার সময় তার ঘরে খাবার দিতে এল যে লোকটি, অনন্তর শরীরের কুশল জিজ্ঞেস করে বলল, "সাব, খেলার খবর শুনছেন না ? নীচে রিসেপশনে টিভি দেখছে, কী ভিড় সেখানে ।"

"স্কোর কী এখন ?"

"চার উইকেট পড়ে গেছে অস্ট্রেলিয়ার...."

অনন্ত প্রায় ঝাঁপিয়েই টু-ইন-ওয়ানটা তুলে বোতাম টিপল। স্টুডিওতে ফিরে যাবার আগে স্কোর পড়া হচ্ছে।

"ইন্ডিয়া অলআউট ২০৫। দিনের তৃতীয় বলেই তারসেম কুমার লটনের বলে ডিপ পয়েন্টে ক্যাচ দিয়ে আউট হয়েছে। সে সাত রান করেছে। লটন ৬২ রানে তিন উইকেট, ব্রাইট ৩১ রানে দু'উইকেট, অ্যামরোজ ৩৩ রানে দু'উইকেট, লেসলি ৫০ রানে তিন উইকেট।

"অস্ট্রেলিয়া লাঞ্চে চার উইকেটে ৭০। সিন্টার ব্যাটিং ৩৬, লটন ব্যাটিং ৯। চারটি উইকেটই দেশরাজ আনোখা পেয়েছে ১০ ওভারে ৩৪ রান দিয়ে। একসময়ে আনোখা ২৯ বলে সাত রান দিয়ে তিনটি উইকেট পায়। অসাধারণ বল করেছে।

"প্রথমে রজার্স একটা লিফ্‌টিং ডেলিভারি থেকে উইকেটকিপার শুক্লকে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যায়। লেগসাইডে ঝাঁপিয়ে খুব শক্ত ক্যাচ নেয়। রজার্স করে দুই, টোটাল তখন নয়। তারপর গেল আরউইন। ১০ রান করেছে। হুক করতে গিয়ে মিসটাইম করে সহজ ক্যাচ তোলে শর্ট উইকেটে আনোখা নিজেই ধরে নেয়। টোটাল তখন ১৬। উডফোর্ড তৃতীয় বলেই শর্ট লেগে নবরকে ক্যাচ দিয়ে শূন্য করে ফিরে যায়, ওই একই টোটালে। বোলান স্লিপে কাম্বাট্টার হাতে ধরা পড়ে ১১ রানে। তখন টোটাল ৫৭। লাঞ্চে অস্ট্রেলিয়া চার উইকেটে ৭০।"

অনন্ত ফিসফিস করে বলল, "আনোখা ফটাফট বাকিগুলোকে নামিয়ে দাও। না হলে আমি মুখ দেখাতে পারব না!"

অস্ট্রেলিয়া চা-এর সময় ১৫৫-৫। পঞ্চম উইকেটটিও আনোখার। কিন্তু সিন্টার আর লটন ৬৯ রান জুড়ে দিয়েছে। কাম্বাট্টার হাতে সিন্টারের ইনিংস শেষ হয়। ৪৭ রান করেছে। লটন ৬৪ আর ফেল্‌পস ১২।

চা-এর পর নাটকের মতো ব্যাপার হল। লটনকে প্রথম বলেই এল বি ডব্লু করল মির্জা। এক রান পরে ব্রাইটকে নিজের বলেই ধরল পটেল। ফেল্‌পস রান আউট ১৭ রান করে। অ্যামরোজ বোল্ড হল মির্জার বলে শূন্য রানে। লেসলি শেষ ব্যাটসম্যান, তাকে নবর লুফল মির্জার বলে পাঁচ

রানে। লেভিন ১৭ রান করে নট আউট থেকে গেল। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস ভারতের প্রথম ইনিংসি থেকে ২২ রানে পিছিয়ে, ১৮৩ রানে শেষ। আনোখা ১৬-২-৬৪-৫ ; মির্জা ১৬-৪-৪৫-৩ ; পটেল ৬-১-১৩-১।

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং অর্ডার বদলে উসমানির জায়গায় কাম্বাট্টা নিজে ওপেন করতে গেল সারিনের সঙ্গে। প্রেস এনক্লোজারে তখন গুঞ্জন উঠল। লটন, ব্রাইট আর অ্যামরোজকে ইনিংসের শুরুতে নতুন বলে খেলতে যাওয়াটা যে কাম্বাট্টার পক্ষে কতটা নির্বুদ্ধিতার কাজ হল, সেটা দেখার জন্য সাংবাদিকরা তৈরি। একজন সবাইকে শুনিয়ে বলল, "বাইরে অ্যাম্বুলেন্স রেডি আছে তো ? বুড়ো বয়সে লটন-ব্রাইটকে খেলার শখ !"

লটনের প্রথম বলটাই বাউন্সার। লেংথ থেকে সামান্য শর্ট, উঠেছেও খাড়াভাবে। কাম্বাট্টা বোধহয় আশা করেনি প্রথম বলেই এমন একটা বাউন্সার পাবে। তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে পিছোতে গিয়ে পিছলে পড়ল।

"কী বলেছিলাম, দেখলে তো !" একটা সগর্ব কণ্ঠ প্রেস এনক্লোজারে ধ্বনিত হল।

"রিফ্লেক্স আর নেই, তবু যে কেন ওপেন করতে নামা !" আর একজন বিরক্তি জানাল।

"দ্যাখো, কাম্বাট্টা এবার লটনকে পিটিয়ে ফায়ারিং লাইন থেকে সরাবার চেষ্টা করবে।" আর এক সতর্ক মন্তব্য হল।

"তার আগেই নিজেকে সরে যেতে হবে— হাসপাতালে।"

কিন্তু কাম্বাট্টা কোনও বোলারকেই পেটাল না, হাসপাতালেও গেল না। দিনের শেষে অপরাজিত রইল ৩৮ রানে, তাতে একটিও বাউন্ডারি নেই। অস্ট্রেলিয়ার তিন ফাস্ট বোলার মোট ২৬ ওভার বল করেও তার ডিফেন্সে ছিদ্র খুঁজে পেল না। ধীর এবং অচঞ্চল থেকে কাম্বাট্টা ভারতের ইনিংস ৬৪ রানে নিয়ে গেল তবে অন্যপ্রান্তে সে হারাল তার তিনজন সঙ্গীকে।

প্রথম উইকেটে যখন ৫০ রান উঠল, সারিনের তখন ১৫। লটনের বল তখন হঠাৎ জমি ঘেঁষে এসে তাকে এল বি ডব্লু করে। আরও পাঁচ রান ওঠার পর ওভারের দ্বিতীয় বলে নবরকে বোল্ড এবং চতুর্থ বলে বেঙ্কটরঙ্গনকে এল বি ডব্লু করে অ্যামরোজ। নবর তিন রান করেছে,

অন্যজন শূন্য। এবারও বল নিচু হয়ে এসে রঙ্গনের প্যাডে লাগে। উসমানি পাঁচ নম্বরে যখন খেলতে নামছে, তখন আর একটা মাত্র ওভার খেলার সময় রয়েছে। কাম্বাট্টা ঝুঁকে পিচ দেখতে দেখতে উসমানিকে কিছু বলল। উসমানিও পিচের দিকে তাকাল।

"এই সময় একজন নাইট ওয়াচম্যানের আসা উচিত ছিল। তা নয়, ফেডিং লাইটে এল কি না স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যান! কী ক্যাপ্টেন্সি যে হচ্ছে!" সাংবাদিকের কথায় অনেকেই সায় দিল।

উসমানি প্রথম বলটাই মিড-অনে ঠেলে দিয়ে এক রান নিল। পরের ওভারে লটনের বাউন্সার হুক করে সে তিন রান পেল। আবার বাউন্সার, কাম্বাট্টাও হুক করল। দু'রান। পরের বলে কাট করে আবার দু'রান। দিনের শেষ বল থেকে সে এক রান পেল ফ্লিক করে।

ভারত ৮৬ রানে এগিয়ে, হাতে আছে সাতটি উইকেট অবশ্য অনন্ত যদি ব্যাট করে। দু'দিনে আউট হয়েছে ২৩ জন। দিল্লিতে প্রথম দিনেই আউট হয়েছিল ১৮ জন। প্রথম দু'দিনে সংখ্যাটা ছিল ২৫। সেই টেস্টে অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করে জিতেছিল পাঁচ উইকেটে। এখানেও তাদের চতুর্থ ইনিংসে খেলতে হবে।

সন্ধ্যার সময় অনন্ত টোকা দিল কাম্বাট্টার ঘরের দরজায়।

"ইয়েস, কাম ইন।"

ঘরে কাম্বাট্টার সঙ্গে রয়েছে বোর্ড-প্রেসিডেন্ট পাণিগ্রাহি, সেক্রেটারি হরিহরণ, ভাইস ক্যাপ্টেন উসমানি এবং ম্যানেজার খান্না। সবাই তাকাল।

"কাল আমি ব্যাট করব।"

"তোমার ব্যাট নয়, আমার দরকার ছিল তোমার বল, যা তুমি দিতে পারলে না। ধন্যবাদ তোমার অফারের জন্য, তোমাকে ব্যাট করতে হবে না।" কাম্বাট্টা শান্ত স্বরে, থেমে থেমে বলল।

"তুমি গোছগাছ করে নিতে পারো, খেলাটা শেষ হলেই তোমাকে কলকাতার প্লেনে তুলে দেওয়া হবে।" হরিহরণের গলায় সামান্য উত্তেজনা এসে পড়ল।

"আমি যদি দুটো রানও করতে পারি, তা হলেও তো টিমের লাভ হবে।" অনন্ত কাতরস্বরে কথাটা বলে সকলের দিকে অনুনয়-ভরা দৃষ্টিতে

তাকাল।

"আজ খেলার পর কম করে দশজন প্রেস রিপোর্টার আমাকে প্রশ্ন করেছে, টিমে একজন প্যাসেঞ্জার কেন রাখা হয়েছে ? তাদের আর বলিনি যে, আমি চিটেড হয়েছি। জবাব দিয়েছি, টিমের নাম সাবমিট করার পর তুমি ড্রেসিং রুমে পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছ। আমাকে মিথ্যে কথা বলতে হল। হ্যাঁ, এখন দুটো রান পেলেও টিম লাভবান হবে ঠিকই, কিন্তু আমরা দশজনেই খেলব। আর এই দশজন একটু চেষ্টা করে তোমার বদান্যতার দান ওই দুটো রান তুলে দিতে পারবে বলেই মনে হয়।" কাম্বাট্টা শব্দগুলোকে চিবিয়ে চিবিয়ে মুখ থেকে বার করল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথা বলতে হচ্ছে বলে যেন বিরক্ত।

"অনন্ত, তুমি কি আজ কোনও টেলিফোন কল পেয়েছ ?" পাণিগ্রাহি জানতে চাইলেন। রাগে, দুঃখে, অপমানে ঝাঁ-ঝাঁ করছে অনন্তর মাথা। সে মাথা নাড়ল।

"আমি রিসেপশন কাউন্টারে জানিয়ে দিয়েছি তোমার ঘরে কোনও কল যেন না যায়। প্রেস এখন ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমার খবর নিতে। তুমি বাইরের কারও সঙ্গে কথা বলবে না, দেখা করবে না, ঘর থেকেই বেরোবে না। আমরা চাই না একটা কেলেঙ্কারির মধ্যে জড়াতে। এটা কি মনে থাকবে ?" হরিহরণ ধমকে উঠলেন।

"এবার তুমি যেতে পারো।" পাণিগ্রাহি দরজার দিকে আঙুল দেখালেন। "তুমি টেস্ট-কেরিয়ার শুরু না করেই শেষ করে দিলে। তোমার জন্য করুণা হচ্ছে।"

অনন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

॥ ১৬ ॥

কোনও এক বিশ্বস্ত সূত্র থেকে কিন্তু স্থানীয় খবরের কাগজের লোকেরা জানতে পেরে গেল।

ডেকান হেরাল্ড হেডিং করল : "সেন ধোঁকা দিয়ে টেস্ট দলে।"

দ্য হিন্দু হেডিংয়ে বলল : "ভার্দে কি এর থেকেও খারাপ ?"

ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের হেডিং : "ভারত দলকে সেনের বাউন্সার।"

কাগজগুলো সরিয়ে রেখে গুম হয়ে অনন্ত বসে রইল। আনোখা মাঠে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। মাঝে মাঝে সে আড়চোখে অনন্তকে দেখছে।

"দেশি, জীবনকে কি কাল দেখতে পেয়েছিলে?"

"লক্ষ করিনি।"

"তুমি ম্যানেজারকে কি বলবে আমাকে আজ রাতের ফ্লাইটেই কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে?"

"সে কী! তুমি সেকেণ্ড ইনিংসে বল করবে না?"

"ব্যাটই করতে দিল না তো...।"

"তুমি চলাফেরা তো দিব্যিই করতে পারছ। আজ আমরা সারাদিন ব্যাট করছিই। কাল রেস্ট-ডে। দু'দিনে তুমি কি ফিট হতে পারবে না? আধা-ফিট হলেও চলবে।"

অনন্ত হাসল। একটা, দুটো, তিনটে ডেলিভারির পরই শিরদাঁড়ার নীচে গজাল পোঁতার মতো একটা যন্ত্রণা ঠুকে ঠুকে কেউ যেন বসাতে থাকে।

"ওরা যেসব কথা আমাকে শোনাল, তার প্রত্যেকটাই তো তোমাকে বলেছি। আমাকে বল করতে দিলেও আমি বোধহয় আর পারব না। শুধু তো শরীর দিয়েই নয়, মন দিয়েও খেলতে হয়।...বেস্ট অব লাক, দেশি।" অনন্ত বিছানায় শুয়ে পাশ ফিরল। এখন সে শুধু ঘুমোবে। রিলেও শুনবে না।

আনোখা বলেছিল 'আমরা সারাদিন ব্যাট করছিই।' কিন্তু চায়ের ঠিক পাঁচ মিনিট আগে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল ২০২ রানে। তার মধ্যে আছে কাম্বাট্টার অপরাজিত ৯৪ রান আর উসমানির ৩৪। দুর্গা দাসের ১২ রান ছাড়া বাকিদের মধ্যে কেউ দ্বিঅঙ্কে পৌঁছতে পারিনি। অ্যামরোজ ৫২ রানে চার উইকেট নিয়েছে ২২ ওভার বল করে। লেসলি নয় রানে দুটি উইকেট। ব্রাইট ২১ রানে দুটি। লটন ২৫ ওভার বল করে একটি উইকেট পেয়েছে ৫২ রান দিয়ে এবং রানের বেশিটাই দিয়েছে কাম্বাট্টাকে। আর ছ'টা রান তুলে সেঞ্চুরি করার সুযোগ যে-কোনও সময়ই কাম্বাট্টা তৈরি করে নিতে পারত। করেনি, শেষের দিকের ব্যাটসম্যানদের আগলে রাখতে গিয়ে সে বহুবার নিজের রান বাড়ানোর সুযোগ অবহেলায়

ছেড়ে দিয়েছে। মাঠ ছেড়ে আসার সময় হাজার কুড়ি দর্শকের সঙ্গে প্রেস এনক্লোজারও উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়েছিল তার উদ্দেশ্যে।

অস্ট্রেলিয়াকে ২২৫ রান তুলে জিততে হবে এবং তাদের হাতে রয়েছে এত সময় যে, সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না।

তৃতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া বিনা-উইকেটে তুলল ৭১ রান। আরউইন ৫৩ আর রজার্স ১৪ রানে ব্যাট করছে। চারটি লেগবাই। উইকেটে কোনও প্রাণ নেই, তবে আকাশে মেঘ ভেসে আসছে। পরশু খেলার চতুর্থ দিন। জেতার জন্য দরকার ১৫৪ রান। চা-এর আগেই নিশ্চয় অস্ট্রেলিয়া তা পেয়ে সিরিজে ৪-০ এগিয়ে যাবে।

সারাদিন ঘরের মধ্যে, অনন্তর আর ভাল লাগছে না। ঘরের বাইরে যাওয়া তার বারণ। মাঠ থেকে আনোখা ফিরে এসে গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে রইল : অনন্ত বোঝে, এই সময়, হারের মুখে দাঁড়ানো লোককে খেলা নিয়ে জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। এতে তাকে কষ্টই দেওয়া হবে।

কিন্তু সে তার নিজের কষ্ট-লাঘবের জন্য এখন কী করবে ? যে পাষাণ তার বুকে ভার হয়ে চেপে রয়েছে, সেটা নামাবে কী করে ? এটাই কি আজীবন তাকে বুকে বয়ে বেড়াতে হবে ?

আনোখা স্নান করে, পোশাক বদলে বেরিয়ে গেল। একটা কথাও অনন্তর সঙ্গে বলেনি। ডাক্তার বলেছে হাড়ের চোট ওষুধ খেয়ে নয়, নড়াচড়া বন্ধ রাখলে আপনা থেকেই কমবে। তার মানে শুধু শুয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকা। বসলে চাপ পড়বে, ব্যথা লাগে। অনন্ত মনে মনে খেপে উঠতে লাগল। সবকিছুর উপরই তার রাগ হচ্ছে, সব থেকে বেশি হচ্ছে নিজের ওপর। 'টেস্ট-কেরিয়ার শুরু না করেই শেষ করে দিলে!' পাণিগ্রাহির কথাটা ঘুরেফিরে তার কানে বাজছে। এত বছরের খাটাখাটুনি, এত আশা, কামনা, আকাঙ্ক্ষা একটা ভুলে সব ধুলোয় মিশে গেল।

ফাঁকা ঘরে বিছানায় শুয়ে থাকা অনন্তর চোখ বেয়ে জল নামল। এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত সে কীভাবে করবে ? পাণিগ্রাহি হরিহরণরা যে-রকম রেগে আছে, তাতে মনে হয় না সে আর কোনওদিন টেস্ট খেলার জন্য

ডাক পাবে। অন্তত যতদিন ওরা ক্ষমতায় থাকবে। ইতিমধ্যে দু'চারজন ফাস্ট বোলারও হয়তো উঠে আসবে। তার সমর্থনে কোনও কাগজে কেউ একটা লাইনও আর লিখবে না। সে এবার শেষ হয়ে গেল।

বিরতি-দিনটাও দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যায় পৌঁছল। আনোখা অন্য-কোনও ঘরে গিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। সারা টিমটাই তটস্থ কাম্বাট্টার কড়া নির্দেশে। বাইরে গিয়ে ঘোরাঘুরি বা কোথাও নিমন্ত্রণ রাখতে যাওয়া একদম বন্ধ। তবে কেউ দেখা করতে এলে বারণ নেই দেখা করায়। মোটকথা দেহ ও মনের শক্তি ক্ষয় করা চলবে না। ম্যাচটা এখনও শেষ হয়ে যায়নি।

ফোন বেজে উঠল।

অনন্ত উঠল ফোন ধরার জন্য। তার কল নয়, নিশ্চয় আনোখার। কোথায় সে এখন কে জানে, ডেকে আনতে হবে।

"হ্যালো।"

"অনন্ত সেনের জন্য কলকাতা থেকে ট্রাঙ্ককল আছে।"

"আমি অনন্ত সেন, লাইনটা দিন।"

অনন্তর পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিদ্যুৎ খেলে গেল। কলকাতা থেকে কে? সে একদমই আন্দাজ করতে পারছে না।

"হ্যালো, অন্তু?"

"মা!"

"আমি সি এ বি অফিসে এখন। এরাই লাইন ধরিয়ে দিলেন।" তনিমা থেমে রইলেন।

"মা। আমি শেষ হয়ে গেছি।"

"অন্তু, তোর নাকি চোট হয়েছে?"

"হ্যাঁ, বাথরুমে স্লিপ করে পড়ে...।"

"অন্তু, এই ফোনটা ধরতে তোকে কতটা হেঁটে আসতে হয়েছে?"

"পাঁচ-ছ'টা স্টেপ।"

"তা হলে তোর পা-দুটো ঠিক আছে।"

"এ-কথা বলছ কেন মা?"

"তোর বাবাকে তুই ভুলে গেলি অন্তু? উনি যা বলতেন কিছুই মনে রাখিসনি?"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

"মিথ্যে কথা।"

অনন্তর বুক কেঁপে উঠল। তার মাকে এমন বাঘিনীর মতো গর্জন করে উঠতে সে কখনও শোনেনি।

"অন্তু যেসব কথা তোর সম্পর্কে আজ কাগজে বেরিয়েছে, সব ধুয়ে-মুছে যাবে যদি তুই বাবার কথাগুলোকে মনে করার চেষ্টা করিস।...আমাদের বাড়িতে ঢুকলেই ওঁর ছবিটার মুখোমুখি হতে হয়, তাই না ? তুই যখনই ঢুকবি একজোড়া চোখ তোকে প্রশ্ন করবে, 'অন্তু তোমার জন্য আমার গর্ব হচ্ছে না কেন ?' তখন তুই কী বলবি ? কী করবি ? এরপর থেকে তোকে খিড়কি দরজা দিয়ে চোরের মতো বাড়িতে ঢুকতে হবে যাতে বাবার মুখোমুখি না হতে হয়।"

"না না, আমি তা পারব না মা।"

"অন্তু নিজেকে কি তোর খারাপ লাগছে ?"

"আমি ঘেন্না করছি নিজেকে।"

"তা হলে এই জীবনের অর্থ কী ? মূল্য কী ? পৃথিবীর কিছুই তো আর তোর কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারবে না ? এই অভিশাপ কাটিয়ে ওঠ অন্তু।"

"কী ভাবে মা ?"

"মনে আছে রে, একদিন উনি বলেছিলেন, সেই স্কুলের টুর্নামেণ্ট খেলার সময় ?" ধীর কোমল নম্র হয়ে এল তনিমার স্বর, স্মৃতিভারে। "আগের খেলায় একই মাঠে একই পিচে তুই উইকেট পাসনি, কিন্তু পরের খেলায় ছ'টা উইকেট পেলি। কেন ? তোর বাবা বললেন, অপ্রত্যাশিত অনেক কিছুই এবার তুই পাবি। তোর বলে ক্যাচ পড়বে, সহজ পিচ, মাঠের খারাপ অবস্থা আর ইনজুরি যেজন্য স্বাভাবিকভাবে বল করতে পারবি না।' তাই বলেছিলেন, 'সব বাধাবিঘ্ন ছাপিয়ে যেতে হবে। যাতে ভাঙা পা নিয়েও বল করে উইকেট পেতে পারো, এমনভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।' অন্তু, তুই কি সেইভাবে গড়ে উঠিসনি ? তোর পা-তো ভাঙেনি, হাত তো ভাঙেনি, একটা চোট কি আত্মমর্যাদার থেকেও বেশি কষ্টের ?

"মা !" ফিসফিস করে অন্তু বলল। "আমাকে এই ম্যাচে আর খেলতে দেবে না।"

"তোমাকে খেলতে হবে, বল করতে হবে। সেজন্য যদি মরে যেতে হয়, যাবে। আমি তোমার মৃতদেহ ফুল-চন্দনে সাজিয়ে তোমার বাবার ছবির সামনে রেখে বলব, একদিন বলেছিলে অন্তু, তোমাকে খুব বড় বলে মনে করি। এই দ্যাখো, কত বড় হয়ে ও ফিরে এসেছে, তোমার কথাই সত্যি হয়েছে...অন্তু...অন্তু আমি বলব তোর বাবাকে...আমাদের ছেলে, দ্যাখো..." কান্নায় ভেঙে পড়তে পড়তে স্বরটা রুদ্ধ হয়ে গেল। রিসিভার যেন পড়ে গেল হাত থেকে।

অন্তু অসহায়ের মতো চারপাশে তাকাল। ব্যথা, যন্ত্রণা, চোট, ইনজুরি হয়েছে না কি ? কই ? ছুটে গিয়ে সে দেওয়ালে আছড়ে দিল পিঠ, কোমর, কই কোথায় ইনজুরি ? ঘরের মাঝে এসে আবার সে ছুটে গিয়ে দেওয়ালে আছাড় খেল। কই ইনজুরি ? "না বাবা, আমার তো লাগছে না। এই দ্যাখো...এই দ্যাখো...এই দ্যাখো।"

উন্মাদের মতো অনন্ত ঘরের দেওয়ালে বার বার নিজেকে আছড়ে ফেলতে লাগল। লাফিয়ে লাফিয়ে মেঝেয় বসে পড়ল ধপাস ধপাস শব্দ করে।

"কিছু হয়নি বাবা। এই দ্যাখো আমি সেরে গেছি।"

চিৎকার করতে লাগল সে। জানলায় গিয়ে রাস্তার আলো, পথচারী আর চলমান গাড়ির উদ্দেশে চিৎকার করে সে বলতে লাগল, "আমার নিজেকে ভাল লাগছে...সবাই শোনো, আমার নিজেকে ভাল লাগছে...আমি খেলব, বল করব...আমি অনন্ত..."

এরপরই টলতে টলতে খাটের কাছে এসে জ্ঞান হারিয়ে সে বিছানায় পড়ে গেল।

॥ ১৭ ॥

মাঠে যাবার জন্য খেলোয়াড়রা একে একে কোচে উঠেই প্রথমে থমকে অবাক চোখে পিছনে বসে-থাকা একজনকে দেখে তারপর সিটে বসল। অনন্ত জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। কাম্বাট্টারও চোখ পড়ল। গম্ভীর হয়ে

গেল তার মুখ।

ড্রেসিং-রুমে অনন্ত একা বসে। সারা টিম মাঠে। ফিল্ডিং প্র্যাকটিস করছে, নেটে বল করছে।

একজন বেয়ারা ঢুকল কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স হাতে নিয়ে।

"একজন পাঠিয়ে দিল আপনাকে দেবার জন্য।"

"আমাকে!"

অনন্ত বাক্সটা হাতে নিয়ে ভাবল, খুলে দেখবে কি? না থাক্। হয়তো ছেঁড়া জুতো বা মরা ইঁদুর পাঠিয়ে কেউ তাকে অপমান করতে চায়। বাক্সটা সে টেবিলে রেখে দিল।

মাঠ থেকে একে একে ওরা ফিরছে। অনন্তকে সবাই এড়িয়ে নিজেদের মধ্যেই কথা বলছে। প্রত্যেকের মুখে গভীরতা, আর সঙ্কল্পের ছাপ।

"আরে এটা কী! কার বাক্স," নবর বলল বাক্সটা হাতে নিয়ে। বাক্সের ঢাকনাটা খুলে সে অবাক স্বরে বলল, "আরে দ্যাখো, দ্যাখো, একটা নকল হাত।"

অনন্ত প্রায় লাফিয়েই চেয়ার থেকে উঠল। "আমার। আমাকে পাঠিয়েছে।"

নবরের হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে দেখল একটা চিরকুট ভিতরে রয়েছে। তাতে লেখা: "এটা আর আমার দরকার নেই। আমার টেস্ট খেলা হয়ে গেছে।—জীবন।"

টিম মাঠে নামার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। অনন্ত মাথা নামিয়ে একদৃষ্টে হাতটার দিকে তাকিয়ে। যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ চটকা ভেঙে গেল যেন। অনন্ত ছুটে বেরোল।

সবার শেষে দ্বাদশ ব্যক্তি বিনয় মারাঠে নামছে সিঁড়ি দিয়ে। অনন্ত তার কাঁধে হাত রাখল

"আমি মাঠে যাচ্ছি, তোমায় নামতে হবে না।"

"সে কী! কই, ক্যাপ্টেন তো আমাকেই..."

"ক্যাপ্টেন ভুল করে বলেছে, আমাকে আজ বল করতে হবে।"

হতভম্ব মারাঠে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রইল। অনন্ত ছুটে মাঠে নামল।

কাম্বাট্টা উইকেটে পৌঁছেছে। আরউইন আর রজার্স মাঠে পা দিয়েছে।

হাজারদশেক দর্শক। কয়েকজন মাত্র তালি দিল।

বিস্ময়ে ভরে উঠল কাম্বাট্টার চোখ। বলল, "তুমি ? কে তোমায় মাঠে নামতে অনুমতি দিয়েছে ?"

"আমায় বল দিন···মাত্র দুটো ওভার। আর চাইব না, মাঠ ছেড়ে চলে যাব।"

কাম্বাট্টা পরে তার আত্মজীবনীতে লেখে : "এই একটা মুহূর্ত যা আমার স্মৃতিতে চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। আমি তাকিয়ে দেখলাম ছেলেটির মুখ। তার আধখানায় রয়েছে দেবতা, বাকি আধখানায় দানব। আমার বুকের মধ্যে একটা কম্পন জাগল।। কী করব ? ওকে মাঠ থেকে বার করে দেব, না বলটা ওর হাতে তুলে দেব ? আমাকে তখনই, এক সেকেণ্ডের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমার জীবনের বোধহয় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত—আমি ওর হাতে বলটা তুলে দিয়ে বললাম, নিজেকে ফিরিয়ে আনো

"ওর প্রথম বল কী গতিতে এল আমি তা দেখতে পেলাম না। শুনেছি ১৯৭২ সালে উৎক্ষিপ্ত পাইওনিয়ার ১০ মহাকাশযান আজও চলেছে মহাকাশ পাড়ি দিয়ে ঘণ্টায় ৪৮ হাজার কিলোমিটার বেগে। অনন্তর বলের গতি বোধহয় ওইরকমই ছিল। আরউইন ব্যাট ফেলে দিয়ে বাঁ হাত চেপে ধরে কুঁজো হয়ে গেল। তার গ্লাভস থেকে বলটা গেল উইকেটকিপারের হাতে। পরের লোক এল উডফোর্ড। তাকে দেওয়া প্রথম বলটা ইনসুইং করে (মনে রাখবেন ২৮ ওভারের পুরনো বল) ব্যাটসম্যানের বুটের কাছে পিচ পড়ল। উডফোর্ড শুধু দাঁড়িয়েই রইল, ব্যাটটা নামাবার কথা ভুলে। একটা বেল ৩০ গজ দূর থেকে কুড়িয়ে আনতে হয়। হ্যাটট্রিকের সামনে এল বোলান। আমরা দশজন ওকে ঘিরে। পরিষ্কার দেখলাম, বোলানের চোখে অনিশ্চিত অস্বস্তি। সে দোনামোনা করে ফরোয়ার্ড ডিফেনসিভ খেলতে গেল। ব্যাট ও প্যাডের ফাঁক দিয়ে বলটা গলে এল ব্রেক ব্যাক করে। আমরা সবাই ছুটে গেলাম অনন্তর দিকে। হ্যাটট্রিক, টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম ভারতীয় বোলার বলেই নয়, আমরা পরাজয়ের দিগন্তে জয়ের সোনালি আলো দেখতে পেয়েছি।

"কিন্তু আশ্চর্য শান্ততা ওর মুখে। বলল, ম্যাচের পর এখন নয়। ৭১-০

থেকে তিন বলেই ৭১-৩। কিন্তু বিস্ময়ের শেষ ছিল অনেকদূরে। অনন্তর পঞ্চম বল মিন্টারের ব্যাট ছুঁয়ে এল স্লিপে আমারই হাতে। ৭১-৪, অনন্তর বোলিং ফিগার, ওভার শেষে হল ১-১-০-৪। একশো বছরের বিশ্ব টেস্ট-ক্রিকেটে বোধহয় খুব বেশি বোলিং নমুনা পাওয়া যাবে না, যা এরপাশে রাখা যায়। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে, চোট থাকার জন্য কোনওরকম যন্ত্রণা দেখতে পাইনি।

"পরের ওভারে মির্জার কাছ থেকে এক রান নিল রজার্স, দু'রান নিল লটন। অনন্ত তার দ্বিতীয় ওভারের চতুর্থ বলে দিল স্লোয়ার বাউন্সার, তার আগে একটা ফাস্টার দিয়েছিল। রজার্স হুক করল। অনুপ্রাণিত ফিল্ডিং যে কী জিনিস বেঙ্কটরঙ্গন তা দেখাল। প্রায় চল্লিশ গজ ছুটে পেছন থেকে উড়ে-আসা বল সে ধরল সামনে ঝাঁপ দিয়ে। অর্ধেক অস্ট্রেলিয়া খতম ৭৪ রানে। অনন্তর দশটা বলে।

"আজও আমি যখন ওই বারোটা মিনিটের কথা ভাবি, মনে হয় যেন অলৌকিক সময়ের মধ্যে ঢুকে ছিলাম। মনে হচ্ছিল বাংলার এই তরুণটির উপর কোনও দৈবশক্তি ভর করেছে। ওকে গত তিনদিন কঠিন কর্কশ কথা বলার জন্য আমি আজও অনুতাপ করি। আসলে আমরা তো রক্তমাংসের মানুষ। কিন্তু ওই সময় অনন্ত তা ছিল না।

"সে তার পঞ্চম ওভারে আবার হ্যাটট্রিকের সামনে। চতুর্থ ও পঞ্চম বলে ফেল্‌পস আর ব্রাইটকে সে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে দুটো লিফটিং ডেলিভারিতে। স্লিপে আমি আর সারিন ক্যাচ দুটো পেয়েছি। লেভিন এল যেন বধ্যভূমিতে। তার হাত থেকে ব্যাট পড়ে গেছল আসার সময়। ষষ্ঠ বলটা লেভিনের পিছনের প্যাডে লাগল। সবাই চিৎকার করে আবেদন জানালাম আউটের জন্য। আম্পায়ার মাথা নাড়লেন। আমরা স্তম্ভিত হলাম। আজও আমি বিশ্বাস করি, লেভিন পরিষ্কার এল বি ডবলু ছিল। অনন্ত এক ইনিংসে দু'বার হ্যাটট্রিক করেছে, এটা রেকর্ড-বইয়ে লেখা থাকবে না, কিন্তু আমার মনের খাতায় তা জ্বলজ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে।

"সাতটা উইকেট পাঁচ ওভারে। অস্ট্রেলিয়ার রান ৮৫। অনন্ত খরচ করছে ছয় রান। এই সময় সাধারণত যা হয়, কেউ একজন রুখে দাঁড়ায়। তাই হল, লটন বেপরোয়া হয়ে উঠল। মির্জারর এক ওভারে ১৪, অনন্তর

এক ওভারে আট রান নিল। লেভিন আউট হল মির্জার বলে একটাও রান না করে। বোধহয় অনন্তর বল থেকে পালাবার জন্যই সে ডলি ক্যাচ বোলারের হাতে তুলে দেয়।

"এবার শুধু সময়ের অপেক্ষা। চার ওভার পরই সেই সময়টা এল। অনন্ত তার নবম শিকারটি তুলে নিল লেসলিকে এল বি ডব্লু করে। আম্পায়ার সেই ভদ্রলোকটিই, যিনি ডাবল-হ্যাটট্রিক থেকে তাকে বঞ্চিত করেছেন। লটন অপরাজিত রইল ৩৯ রানে। অস্ট্রেলিয়া ঠিক একঘণ্টা ব্যাট করেছে চতুর্থ দিনে। এই সময়ে ঠিক ৬০ রান যোগ করেছে। ১৩১ রানে ইনিংস শেষ করে ওরা হারল ৯৩ রানে। অনন্তর বোলিং: ১২-৭-২১-৯।

"ড্রেসিং রুমে একটা অদ্ভুত দৃশ্যের কথা না বললে ব্যাপারটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ম্যাচটা শেষ হবার পর যে উল্লাস প্রত্যাশিত ছিল, সেটা ফেটে পড়তে কিছুটা সময় নেয়। সারা স্টেডিয়াম এই অবিশ্বাস্য বোলিংয়ের ধক্কায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। ভারত দলের প্রত্যেকের চোখে আমি জল দেখেছি। বহু দর্শকের চোখেও। কিন্তু অনন্ত ছিল ধীর, অচঞ্চল ও নম্র। সে পিচ থেকে একটু মাটি তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলে মাটিটুকু পকেটে রেখে দেয়। এই একটা সময়েই তার মুখে যেন কান্নার আভাস দেখেছিলাম। মাঠ ছাড়ার সময় ও আমাকে বলল, "সার, আপনাকে ধন্যবাদ, আমাকে আজ সুযোগ দেবার জন্য।" আমি অবশ্য খুব গম্ভীর থাকার চেষ্টা করে বলি, "আর কখনও মিথ্যে কথা বলবে না।" আর মনে মনে বলি, অনন্ত নিঃসন্দেহে তুমি চরিত্রবান। তা না হলে এভাবে জ্বলে উঠতে পারতে না। আমার ক্রিকেট-জীবনের অস্তবেলায় যে সম্মান তুমি উপহার দিলে, তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকব আমরণ। এই ম্যাচ যে জিতব, আমি মাঠে নামার সময়ও তা ভাবিনি।

"তারপর ড্রেসিংরুমের সেই দৃশ্য। আনোখা একসময় টানতে টানতে এক যুবককে নিয়ে এল, যার ডান হাতটা কবজির কাছ থেকে কাটা। সে চুপচাপ বসেছিল কোথায় যেন। অনন্তরই বন্ধু। আনোখা চেঁচিয়ে বলল, "এই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। অনন্তকে আজ ওই খেপিয়ে দিয়েছে।

এরপর অনন্ত আর তার বন্ধু বাংলায় কথা বলতে লাগল। যেহেতু আমি বাংলা ভাষাটা জানি না, তাই আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় ওরা কী বলছিল।"

"অন্তু আমার হাতটা এবার ফেরত দে, লাগিয়ে দে।"

"দোব না। তা হলেই তুই ওটা দিয়ে আমায় তো মারবি।...মারবি না বল?"

"মারব না।"
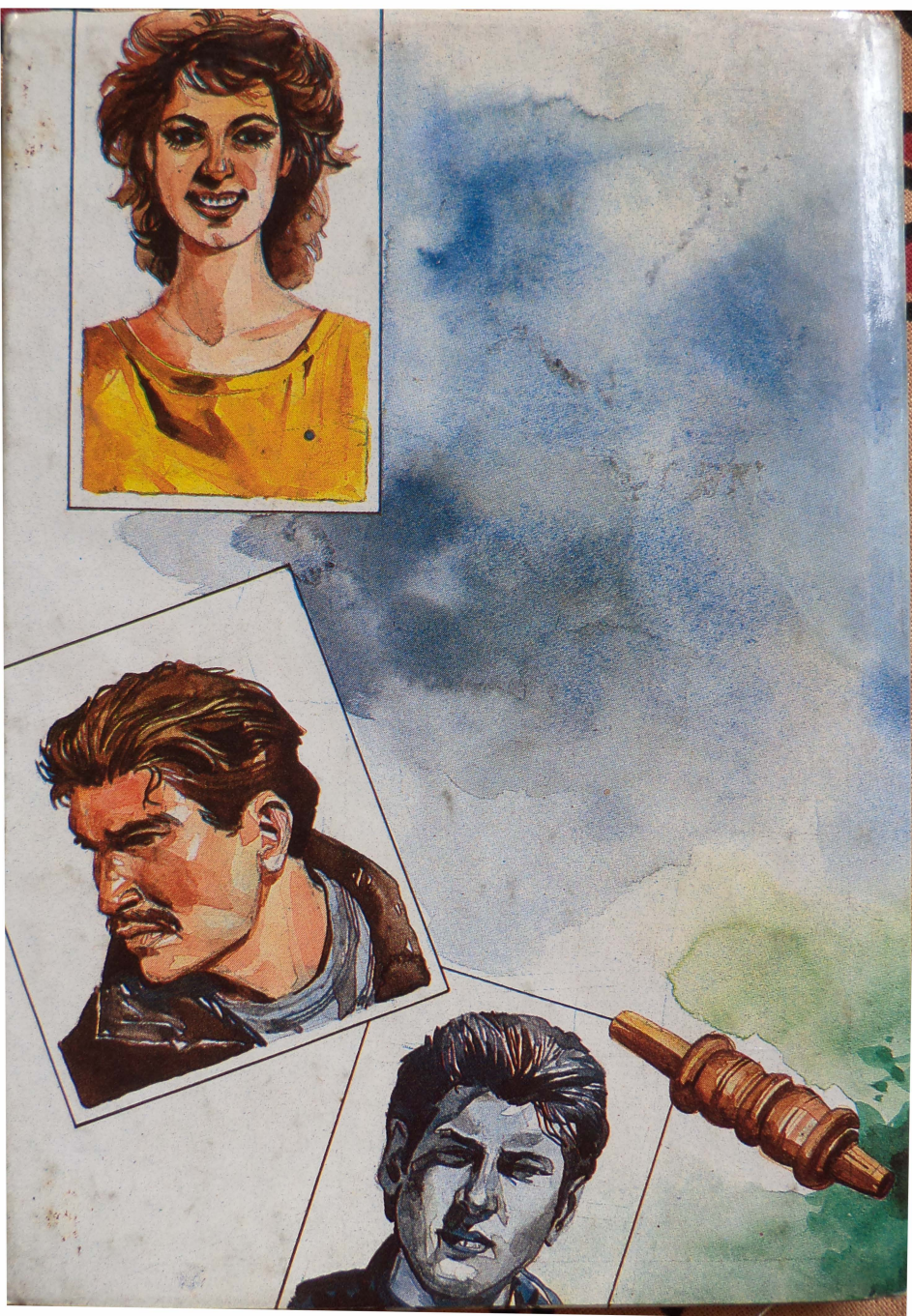
অনন্ত নিজের ডান হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই নে তোর হাত।"